৩

অগ্নিবীণা বাজাও তুমি
কেমন করে?
আকাশ কাঁপে তারার আলোয়
গানের ঘোরে।
তেমনি করে আপন হাতে
ছুঁলে আমার বেদনাতে,
নূতন সৃষ্টি জাগলো বুঝি
জীবন পরে।
বাজে বলেই বাজাও তুমি
সেই গরবে
ওগো প্রভু আমার প্রাণে
সকল সবে।
বিষম তোমার বহ্নিঘাতে
বারে বারে আমার রাতে
জ্বালিয়ে দিলে নূতন তারা
ব্যথার ভরে।

৪

আঘাত করে নিলে জিনে,
কাড়িলে মন দিনে দিনে।
সুখের বাধা ভেঙ্গে ফেলে
তবে আমার প্রাণে এলে,
বারে বারে মরার মুখে
অনেক দুখে নিলেম চিনে।
তুফান দেখে ঝড়ের রাতে
ছেড়েছি হাল তোমার হাতে।
বাটের মাঝে হাটের মাঝে
কোথাও আমায় ছাড়লে না যে,
যখন আমার সব বিকালো
তখন আমায় নিলে কিনে॥

৫

চরণ ধরিতে দিয়ো গো আমারে
নিয়োনা নিয়োনা সরায়ে।
জীবন মরণ সুখ দুখ দিয়ে
বক্ষে ধরিব জড়ায়ে।
স্খলিত শিথিল কামনার ভার
বহিয়া বহিয়া ফিরি কত আর,
নিজ হাতে তুমি গেঁথে নিয়ো হার,
ফেলোনা আমারে ছড়ায়ে।
চির পিপাসিত বাসনা বেদনা
বাঁচাও তাঁহারে মারিয়া;
শেষ জয়ে যেন হয় সে বিজয়ী
তোমারি কাছেতে হারিয়া।
বিকায়ে বিকায়ে দীন আপনারে
পারি না ফিরিতে দুয়ারে দুয়ারে
তোমারি করিয়া নিয়ো গো আমারে
বরণের মালা পরায়ে॥

৬

মন জাগো মঙ্গল লোকে
অমল অমৃতময় নব আলোকে
জ্যোতি বিভাসিত চোখে।
হের গগন ভরি জাগে সুন্দর
জাগে তরঙ্গে জীবন সাগর
নির্মল প্রাতে বিশ্বের সাথে
জাগো অভয় অশোকে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বারাণসী-তত্ত্ব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শৈব সম্প্রদায়। কাশীর দেড়ভাগ লোক শৈব। শৈবগণ উনবিংশ শাখায় বিভক্ত, যথা—(১) দণ্ডী, (২) অগ্নিহোত্রী, (৩) যোগী, (৪) শঙ্করাচার্য্য, (৫) অতিথ গোঁসাই বা সন্ন্যাসী, (৬) সংযোগী, (৭) নাগা, (৮) অবধূত, (৯) ঊর্দ্ধবাহু, (১০) আকাশমুখী, (১১) কড়ালিঙ্গী, (১২) রোখড়, (১৩) অঘোর, (১৪) অঘোরী, (১৫) অলখনামী, (১৬) জঙ্গম, (১৭) নখী, (১৮) জোক্রী এবং (১৯) পরমহংস।

দণ্ডী। যাঁহারা দণ্ড ধারণ করিয়াছেন তাঁহারাই দণ্ডী। দণ্ডটি বংশ নির্ম্মিত এবং তদুপরি একখণ্ড গৈরিক বস্ত্র বাঁধা থাকে। এই দণ্ডটিকে সর্ব্বদাই হস্তে রক্ষা করিতে হয়; মৃত্তিকায় রাখা নিষেধ। বিলাস সামগ্রীর মধ্যে তাঁহাদের একমাত্র কমণ্ডলু। ইহাতেই তাঁহারা পানাহার করিয়া থাকেন। দণ্ডীরা গাত্রে লোম থাকিতে দেন না। ক্ষৌরকর্ম্ম দ্বারা বিগতলোম হইয়া সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম লেপন করিয়া থাকেন। কটিতটে কাপড় ও গলদেশে চাদর দৃষ্ট হইয়া থাকে। কামিনী কাঞ্চন ইঁহাদিগের সেব্য নহে। উদরপূর্ত্তির জন্য ইঁহারা স্বয়ং পাক করেন না। মধ্যাহ্ণ সমাগত হইলে কোনো ব্রাহ্মণের বাটীতে যাইয়া অতিথি হন। এইরূপে ইঁহাদিগের ভোজনক্রিয়া নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। ঈশ্বরচিন্তাই ইঁহাদিগের জীবনের মুখ্য ব্রত। দিবানিশি ভগবৎ চিন্তায় এবং নিভৃতবাসে ইঁহারা কালক্ষেপ করেন। ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় ব্যতীত অন্য কোনো জাতি এই দলভুক্ত হইতে পারে না। ইঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই বেদপারগ এবং শাস্ত্রজ্ঞ। ব্রহ্মসূত্র (পৈতা) অথবা কণ্ঠি ইঁহারা ধারণ করেন না। জীবাত্মা বক্ষচ্যুত হইলে ইঁহাদিগের অগ্নিসংস্কার হয় না—নদীতে শব ফেলিয়া দেওয়া হয়। হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে ইঁহাদিগের সম্মান অধিক। বেদে ইঁহাদিগকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণগণ জীবনের অন্তিম দশায় দণ্ডগ্রহণ পূর্ব্বক ঈশ্বর প্রণিধানে রত হন। বারাণসীক্ষেত্রে এবং দাক্ষিণাত্যে বহু দণ্ডী দৃষ্ট হইয়া থাকে।

অগ্নিহোত্রী। অগ্নিহোত্রীগণ অগ্নির উপাসক। ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীগণ অগ্নিকুণ্ড মধ্যে রাখিয়া মুখোমুখী উপবেশন করতঃ দিনে বারত্রয় হোম করেন। হোম ইঁহাদিগের নিত্যকর্ম্ম; আমরণ হোম করিতে হইবে। ইঁহারা অগ্নি নির্ব্বাণ হইতে দেন না। যদি দৈবাৎ অগ্নি নির্ব্বাপিত হয় তবে বিধিমত তাহার অর্চ্চনা করিয়া অগ্নিকে পুনঃসংস্থাপিত করিতে হয়।

যোগী। ইঁহাদিগের মধ্যে নবাগত ব্যক্তিদিগকে কর্ণে কুণ্ডল ধারণ করিতে হয়। পরিধানে ছিন্নবাস, মস্তকে টুপি, শরীরে ভস্মলেপন এই সম্প্রদায়ের বিধি। পূর্ব্বে জনসমাজের বিশ্বাস ছিল যে, যোগীগণ ঐশ্বরিক শক্তিসমন্বিত; জন্ম মৃত্যু, জরা, বার্দ্ধক্য ইঁহাদিগের ইচ্ছাধীন। ইঁহারা যোগবলে শূন্যে বিচরণ করিতে সমর্থ। এক্ষণে সে বিশ্বাস আর নাই। যোগীগণ অধঃপতিত হইয়াছেন। মাংস মদিরা ইঁহাদিগের সেব্য। ভৈরবনাথ এবং হনুমান ইঁহাদিগের উপাস্য দেবতা। ইঁহারা বলেন যে, মহাদেব স্বয়ং এই দলের স্রষ্টা। গোরখনাথ এবং মোচ্ছন্দরনাথ যোগের নিয়ন্তা। অন্যান্য ক্রিয়ার সঙ্গে পাতঞ্জলী সূত্রমত কার্য্য করা ইঁহাদিগের সমাজের বিধি।

শঙ্করাচার্য্য। শঙ্করাচার্য্য এই সম্প্রদায়ের স্রষ্টা। শঙ্কর শিবের অবতার। বৌদ্ধধর্ম্মে যখন আবর্জ্জনারাশি আসিয়া ধর্ম্ম পঙ্কিল করিল, তখনি দেবাদিদেব মহাদেব শঙ্কর মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হইলেন।

অতিথ গোঁসাই বা সন্ন্যাসী। জাতি-নির্ব্বিশেষে সকলেই এই দলভুক্ত হইতে পারেন। গৈরিক বসন ইঁহাদিগের পরিধেয় বস্ত্র। ভিক্ষাই ইঁহাদিগের উপজীবিকা। ইঁহারা দারপরিগ্রহ করেন না। গোঁসাইগণ বালক ক্রয় করেন এবং তাহাদিগের মস্তক মুণ্ডন করিয়া আপনাদিগের শিষ্য করেন। পুত্রনির্ব্বিশেষে বালকগণ লালিত পালিত হয় এবং পরে গুরুর দেহান্তে শিষ্যদিগের মধ্য হইতে একজন গুরু নির্ব্বাচিত হন। ইঁহাদিগের আবাস "মঠ" নামে খ্যাত এবং ইঁহাদিগের নামের পরে গির, পুরী, ভারতী প্রভৃতি উপাধি দৃষ্ট হইয়া থাকে।

সংযোগী। সংযোগীগণ অতিথ গোঁসাইয়ের মত থাকেন তবে পার্থক্য এই যে, ইঁহারা বিবাহ করিতে পারেন।

নাগা। পূর্ব্বে নাগাগণকে বৈষ্ণব-সম্প্রদায় ভুক্ত বলা হইয়াছে, কিন্তু অতিথ গোঁসাইদলের যদি কোনো ব্যক্তি কোনো কারণ বশতঃ বিতাড়িত হয় তবে সে নাগা আখ্যা পাইয়া থাকে। বিষ্ণু ইঁহাদিগের উপাস্য দেবতা নহেন। মহাদেব ইঁহাদিগের অভীষ্ট দেবতা।

অবধূত। অবধূতগণ নগ্নাবস্থায় বাস এবং জটা ধারণ করেন। শীতকালের দারুণ শীতে শীতনিবারণার্থ ধূলিই ইঁহাদিগের একমাত্র অবলম্বন। ইঁহারা নিরীহ জাতি। ভিক্ষাই ইঁহাদিগের উপজীবিকা।

ঊর্দ্ধবাহু। ইঁহারা শূন্যে হস্ত উত্তোলন করিয়া রাখেন। হস্তের নখ কর্ত্তন করেন না। হস্ত উত্তোলন জন্য রক্ত সঞ্চারণ বন্ধ হইয়া হস্ত উর্দ্ধেই রহিয়া যায়, নিম্নে আর আইসে না। ঊর্দ্ধবাহুরা উলঙ্গ থাকে এবং লোক-প্রদত্ত ভিক্ষা দ্বারা জীবন যাপন করে।

আকাশমুখি। ইঁহাদিগের জীবনের সহিত ঊর্দ্ধবাহুর জীবনের সাদৃশ্য আছে। বিশেষত্ব এই যে, ইঁহারা আকাশের দিকে চাহিয়া থাকেন।

রুদ্রালিঙ্গী। এই সম্প্রদায়ের সন্যাসীগণ আপন উপস্থ দেশে ছিদ্র করিয়া লৌহবলয় (কড়া) পরিধান করে। সুতরাং ইহারা কামজয়ী।

রোখড়। নাগা এবং অতিথ গোঁসাইদিগের সহিত ইঁহাদিগের বাহ্যিক সাদৃশ্য আছে। ইঁহারা অধিক ধার্ম্মিক বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইঁহারা ভিক্ষোপজীবী। ভিক্ষাকালীন ইঁহারা হস্তে অগ্নি-সংধুক্ত পাত্র লইয়া যাইয়া গৃহস্থের দ্বারে অগ্নিতে ধুনা নিক্ষেপ করেন ও ভিক্ষা চান। ইঁহাদিগের মস্তকে গোল টুপি, পরিধানে লম্বা জামা।

অঘোর। অঙ্গে ভস্মলেপন, মস্তক মুণ্ডন, অখাদ্য বস্তুর পান আহার অঘোরদিগের ধর্ম্ম। ইহাদিগকে দেখিলে ভয়ের সঞ্চার হয়। ইহারা ভিক্ষোপজীবী এবং কেহ কেহ ইন্দ্রজাল বিদ্যাবিশারদ। কুক্কুর ইহাদিগের সহচর।

অঘোরী। অঘোরীগণ সর্ব্বদাই মদ্য পানে মত্ত থাকে। সকল মাংসই ইহাদিগের ভোজ্য—এমন কি রক্তমাংসেও ইহাদিগের অরুচি নাই। ইহারা অঙ্গে মুত্র বিষ্ঠা লেপন—এমন কি সেবনও করিয়া থাকে।

অলখনামী। এই সম্প্রদায়েরা "অলখ" নাম উচ্চারণ করে। বসন ভূষণের মধ্যে ইহাদিগের মস্তকে লম্বা টুপি, এবং পরিধানে কম্বলের জামা। ইহারা ভিক্ষোপজীবী। লোকের নিকটে গিয়া একবার মাত্র অলখ নাম উচ্চারণ করিবামাত্র যদি ভিক্ষা পায় তো গ্রহণ করে নতুবা অন্যত্র গমন করে।

জঙ্গম। জঙ্গম সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ গৈরিক বস্ত্র পরিধান, অঙ্গে ভস্মলেপন, এবং কণ্ঠে শিবের তাম্র মূর্ত্তি-সংযোজিত রুদ্রাক্ষ মালাধারণ করে। হস্তেও রুদ্রাক্ষমালা দৃষ্ট হইয়া থাকে। ভিক্ষাই ইহাদিগের উপজীবিকা। ইহাদিগের মধ্যে ধনীও দেখিতে পাওয়া যায়। বারাণসীধামে ইহাদিগের জঙ্গমবাড়ী নামে একটি বাড়ী আছে।

নখী। নখীগণ কখনো নখ কর্ত্তন করে না।

ঝোক্রী। পরিধানে গৈরিক বসন এবং পাগড়ীর উপরে মহাদেবের ছবি ঝোক্রী সম্প্রদায়ের চিহ্ন। কেহ কেহ তাহাদিগের জটার মধ্যে একটি জলপূর্ণ পাত্র রাখিয়া দেয় এবং মস্তক সঞ্চালন দ্বারা জল নিপতিত করে। মূর্খেরা বিশেষতঃ মহিলাগণ ভাবে যে, সন্ন্যাসীটি সিদ্ধ পুরুষ নতুবা মস্তক হইতে সহসা বারিপতন কি করিয়া সম্ভবে। কেহ কেহ কপর্দ্দক-সুশোভিত বস্ত্রাচ্ছাদিত ষাঁড় লইয়া ভিক্ষা করে।

পরমহংস। শৈব সম্প্রদায়ের মধ্যে পরমহংস দলটিই অত্যন্ত ধার্ম্মিক। ইঁহারা নগ্ন ও বাক্‌শূন্য হইয়া কালাতিপাত করেন। যদি কেহ ইঁহাদের মুখে কিছু খাদ্য বস্তু দেয় তবে ইঁহারা ভক্ষণ করেন, নতুবা উপবাসী থাকেন। খাইবার জন্য ইঁহারা নিজ হস্ত ব্যবহার করেন না।

শাক্তগণ চারিভাগে বিভক্ত, যথা,—(১) ভকত (ভক্ত) বা সন্ত, (২) ওয়ামী বা বামী, (৩) কাঞ্চলিয়া এবং (৪) কড়ারী।

ভক্ত বা সন্ত। ভক্ত সম্প্রদায়ের লোকেরা দেবীর উপাসক। ইহাদিগের কেহ কেহ মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে, কিন্তু কেহই আসবপায়ী নহে। সাধারণতঃ তাহারা কোনো-না-কোনো বাণিজ্য করে। পাঞ্জাবীগণ দেবীর অত্যন্ত ভক্ত। প্রত্যেক মাসের ২৩ তারিখে তাহারা আটার একটি দীপ তৈয়ার করে এবং তাহাতে তৈল সংযুক্ত করিয়া প্রজ্বলিত করে। এই দীপালোক অত্যন্ত পূত পদার্থ। আশ্বিন এবং চৈত্র মাসে নয় দিন ধরিয়া ভক্তগণ উপবাস করে এবং দিবারাত্র দেবীর পূজা করে।

ওয়ামী বা বামী। জাতি নির্বিশেষে লোকে ওয়ামী বা বামী দলভুক্ত হইতে পারে। ভক্তগণ স্ত্রী সমভিব্যাহারে কোনো নির্দ্দিষ্ট সময়ে গুরুসকাশে গমন করত কতকগুলি ক্রিয়া করে; উহার বিবরণ অদ্যাপিও জানিতে পারা যায় নাই।

কাঞ্চলিয়া। আমরা পূর্ব্বে ওয়ামী ও বামী সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছি কাঞ্চলিয়া সম্বন্ধেও তাহা প্রযোজ্য। ইহারাও দেবীর উপাসক।

কড়ারী। কড়ারী সম্প্রদায়ের লোক মাত্রেই মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ। এক্ষণে এই সম্প্রদায়ের লোক কচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রবাদ এইরূপ যে, ইহারা নরবলি দিত। জামাই বা ভাগিনেয় বলির জন্য নির্ব্বাচিত হইত।

নানকসাহি সম্প্রদায় ও তাহার শাখা। নানকসা একজন পাঞ্জাবের ফকির। ইহার প্রসিদ্ধি এরূপ ছিল যে, গঙ্গা নদী হইতে আটক পর্য্যন্ত সহস্র সহস্র ব্যক্তি তাঁহার চেলা হয়। নানক জাতিতে ক্ষত্রিয় এবং সম্রাট বাবরের সমসাময়িক লোক। যৌবনের অঙ্কুরকাল হইতেই তিনি সাধুবৃত্তি অবলম্বন করিয়া তীর্থ পর্য্যটন করেন। তাঁহার জীবনী জনম-শাখী এবং অন্যান্য পুস্তকে বিবৃত আছে। নানকের উপদেশ "গ্রন্থ" নামক পুস্তকে সন্নিবদ্ধ হইয়াছে। শিষ্য মাত্রেই উক্ত পুস্তক একখানা করিয়া রাখিয়া দেয়। নানকের মৃত্যুর পর ঐ সম্প্রদায়টি ৭ ভাগে বিভক্ত হয়; যথা—(১) উদাসী, (২) গঞ্জবক্সী, (৩) রামরায়, (৪) সুদরসাহি, (৫) গোবিন্দ সিংহি, (৬) নির্ম্মলা এবং (৭) নাগা।

উদাসী। উদাসী-দলভুক্ত ব্যক্তিগণ নির্জ্জনে বাস করেন। ইঁহাদিগের পরিধানে ফকিরী পোষাক; মস্তকের টুপি লম্বা—দেখিতে বাউলের ন্যায়। ইঁহারা মস্তকের কেশ কর্ত্তন করেন না এবং যে বাটীতে বাস করেন তাহার নাম "সঙ্গত"।

গঞ্জবক্সী। এই দলের প্রতিষ্ঠাতার নাম গঞ্জবক্স। ইনি জাতিতে ব্রাহ্মণ এবং নানকসাহের শিষ্য। গুরুর নিকট হইতে তিনি যে নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন

সেই নামেই তিনি তাঁহার সম্প্রদায়ের নামকরণ করেন। সম্প্রদায়টি নানক সাহের ধর্ম্মনীতি মানিয়া চলে।

রামরায়। রামরায় নানকসাহের অপর একটি শিষ্য। তিনি এই দলের প্রতিষ্ঠাতা।

সুৎরসাহি। সুৎরা একজন নানক-সাহি ক্ষত্রিয়। নানকের গদী-প্রাপ্ত গোবিন্দ সিংহের পিতা তেগ বাহদুর ইঁহার গুরু। সুৎরা আমোদপ্রিয় ব্যক্তি ছিলেন। এমন কি গুরুর সহিত উপহাস না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। সুৎরার শিষ্যগণ হস্তে দুইটি কাঠি বাজাইয়া ও তৎসঙ্গে ব্যঙ্গসূচক গীত গাইয়া দোকানদারদিগের নিকট হইতে ভিক্ষা করে।

গোবিন্দসিংহি। এই দলের নামকরণ প্রতিষ্ঠাতার নামেই করা হইয়াছে।

নির্ম্মলা। গোবিন্দ সিংহই এই সম্প্রদায়ের মূল। ইঁহার শিষ্যগণ সন্ন্যাসী। পরিধানে ধুতি ও চাদর। ইঁহারা বিধান এবং বাহ্যদৃশ্যে উদাসিদিগের ন্যায়। নানকসাহের উপদেশ যে, বেদানুকূল তাহাই প্রতিপন্ন করা এই সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্য। ইঁহারা সংযমী এবং ঈশ্বর-চিন্তায় সদাই মগ্ন থাকেন। বেনারসে এই সম্প্রদায়ের অনেক লোক দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু পাঞ্জাবেই ইঁহাদিগের দল অধিক।

নাগা। নানকসাহি নাগাগণ বৈষ্ণব এবং শৈব নাগাগণের ন্যায় থাকে।

জৈন। জৈনগণ হিন্দু। ইঁহারা হিন্দুর এক শাখা মাত্র। হিন্দুদিগের ধর্ম্মবিপ্লবে অনেক পন্থাই গঠিত হইয়াছে—জৈনগণও এক পন্থীভুক্ত। ইঁহারা জাতিতে বৈশ্য। ব্যবসা ইঁহাদিগের উপজীবিকা। ইঁহাদিগের শাখা জাতির নাম অসওয়াল, শ্রীমল শ্রীশ্রীমল, পরোয়াল, দিসাওয়াল, খানদেলবাই, মহেশ্রী, আগরবাল, মারবাড়ী ইত্যাদি। ইঁহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না কিন্তু বৌদ্ধদিগের ন্যায় সাংসারিক তাবৎ পদার্থই অনাদি বলিয়া মান্য করিয়া থাকেন। আত্মা কর্ম্মানুযায়ী স্বর্গ বা নরকে গমন করে। পুনর্জ্জন্মে ইঁহাদিগের বিশ্বাস আছে। ভোগক্ষয় হইলে আর জন্ম মৃত্যুর ধার ধারিতে হয় না—নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়। ২৪ জন তীর্থঙ্কর নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইঁহারা এই তীর্থকর দিগের মূর্ত্তির উপাসক। জৈনগণ দুই ভাগে বিভক্ত যথা দিগম্বরী এবং সিতম্বরী। দিগম্বরীগণ তাঁহাদিগের উপাস্য মূর্ত্তিকে নগ্ন রাখেন; সিতাম্বরীগণ বসন ভূষণ পরাইয়া দেন। পারত্রিক শিক্ষাদাতা যদি পুরুষ হয় তবে তাহার নাম যতি এবং স্ত্রীলোক হইলে গুরুণী হইয়া থাকে। যতিগণ এবং গুরুণীগণ বিবাহ করেন না। চেলাগণ যতি বা গুরুণীতে উন্নীত হন। জীবরক্ষাই ইঁহাদিগের প্রধান ধর্ম্ম। সর্পবধেও ইঁহারা কুণ্ঠিত হন; এমন কি বৃক্ষাদি কর্ত্তনও ইঁহাদিগের নিকট পাপের মধ্যে গণ্য। পাছে মুখে পতঙ্গ প্রবেশ

করে, সেই আশঙ্কায় কোনো কোনো যতি মুখে কাপড় বাঁধিয়া রাখেন। জৈন ধর্ম্ম হইতে বোধ হয় বৌদ্ধ ধর্ম্মের উদ্ভব।

ষোড়শ অধ্যায়।

জাতি, আবাস ভবন, দেশাচার, সভা সমিতি, উদ্যান ও খনিজ পদার্থ।

হিন্দুগণ চারিবর্ণে বিভক্ত যথা,—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র। ইহাদিগের প্রত্যেকটির আবার বহু শাখা আছে। ব্রাহ্মণগণের শাখা-জাতির মধ্যে সরবেরিয়ার সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। অবশিষ্ট ব্রাহ্মণজাতি কান্যকুব্জ, গৌড়, সারস্বত, মহারাষ্ট্রীয়, সাকলদ্বিপী এবং বাঙ্গালী। বাঙ্গালীদিগের মধ্যে অধিকাংশই কান্যকুব্জোদ্ভূত। সাকলদ্বিপী ব্রাহ্মণগণ জাত্যাংশে হীন। এতদ্ব্যতীত মহাব্রাহ্মণ ও ভূমিহার ব্রাহ্মণ বেনারসে দৃষ্ট হয়। ব্রাহ্মণগণের মধ্যে প্রায় সকলেই পূজা পাঠ করিয়া গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ করেন। তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা ধনী ব্যবসাই তাঁহাদিগের উপজীবিকা। সরবেরিয়া এবং সরযুপারী ব্রাহ্মণ এক জাতি। "সরযূ" (ঘর্ঘরা) নদী পার হইতে যাঁহারা আসিয়াছেন তাঁহারাই সরযূপারী। সরোয়ার সরযূ পারের অপভ্রংশ। গোরক্ষপুর, বস্তি এবং অযোধ্যার কিয়দংশ সরযূপার নামে খ্যাত। ভূমিহারের শাখা-জাতি গৌতম। বেনারসের মহারাজা এই জাতির এক জন। কিথু মিশ্র নামে জনৈক ব্রাহ্মণ ইহাদিগের পূর্ব্বপুরুষ। কিথু মিশ্র বরুরাজার গুরু ছিলেন। রাজার দান গ্রহণ করিবেন না বলিয়া তাঁহার পণ ছিল। একদা বরুরাজা গুরুর অজ্ঞাতসারে তাঁহার পাগড়ির মধ্যে নিষ্কর জমির দান-পত্র লুকাইয়া রাখেন। কিথু মিশ্র স্নান করিবার সময় সেই দানপত্র দেখিয়া ক্রোধে অভিশাপ দেন যে, রাজার সমুদয় রাজ্য তাঁহার বংশধরগণের হস্তে আসিবে। সে অভিশাপ কিন্তু দুর্ব্বার ফলিয়াছে। বারাণসীর মহারাজা কিথু মিশ্রের বংশ।

ক্ষত্রিয় জাতির মধ্যে লোকগণনায়, রঘুবংশী, ভৃগুবংশী, নাগবংশী, বাইস, গৌতম, বিসন, সূর্য্যবংশী, চ্যাণ্ডেল, বনাকর এবং বরৌলিয়া জাতি প্রধান। শেষোক্ত জাতিটি ভৃগুবংশীয়গণের শাখা মাত্র। রঘুবংশীয়গণ অযোধ্যার রাজা রঘুর বংশোদ্ভব। দেওকুমার নামে জনৈক রঘুবংশীয় সন্তান বারাণসীধামে আসিয়া বরু রাজার আতিথ্য স্বীকার করেন। পরে তাঁহার সহিত বরু রাজার কন্যার বিবাহ হয়। কাটিহারের নৈয়ার তালুক বিবাহের যৌতুক-স্বরূপ প্রাপ্ত হন। নাগবংশী রাজপুতগণ ছোটনাগপুর হইতে বারাণসীধামে আইসেন। বারাণসী ধামের নাগবংশীয় রাজপুতগণের গোত্র "বাৎস"। পুরাণে যে নাগবংশের উল্লেখ দেখা যায় বেনারসের নাগবংশীয়গণ তাঁহারই বংশধর। রাজা তক্ষক এই জাতির পূর্ব্বপুরুষ।

বৈশ্য জাতির মধ্যে যাঁহারা ব্যবসা

বাণিজ্য লইয়া আছেন তাঁহাদিগের মধ্যে অগ্রবাল, খুদর এবং রাস্তোগী সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ। কৃষকদিগের মধ্যে কোরাই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। ইহারা অন্যান্য কৃষি কার্য্য তেমন করে না, তবে ইক্ষু আহিফেন এবং অপরাপর ফলকর শস্য উৎপাদন করিয়া থাকে।

হিন্দুদিগের মধ্যে যেমন অনেক জাতি এবং শাখা-জাতি আছে, মুসলমানদিগেরও তদনুরূপ আছে। জুলাহা, সেখ, সৈয়দ, পাঠান, দর্জ্জি, মোগল, কুঁজড়া, ফকির প্রভৃতি অনেক জাতিই মুসলমানদিগের মধ্যে দৃষ্ট হইয়া থাকে। বারাণসীয় জুলাহাগণ বহুলাংশে হিন্দু ছিল। মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়ার পর হইতে ইহারা ভয়ানক হিন্দুদ্বেষী হইয়াছে। অন্যান্য মুসলমান অপেক্ষা ইহারা কলহ-কারী। বারাণসীধামে যে, সময়ে সময়ে ধর্ম্মসূত্রে হাঙ্গামা হইয়াছে তাহার মূল জুলাহাগণ। মুসলমানদিগের মধ্যে সৈয়দ, মোগল ও পাঠান জাত্যাংশে শ্রেষ্ঠ। পাঠান জাতির মধ্যে লোডী, ঘোরী, আফ্রিদি এবং বঙ্গশ বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হইয়া থাকে। সৈয়দ এবং মোগল জাতি জমিদার-শ্রেণীভুক্ত। সৈয়দেরও বহু শাখা-জাতি আছে; তন্মধ্যে রিজুভি, হুসেনী এবং জাকারী শ্রেষ্ঠ। মোগলগণও বহু নামে আখ্যাত হইয়া থাকেন; তন্মধ্যে চাগতাই দলই শ্রেষ্ঠ। দিল্লীর বাদশাহের বংশধরগণ —যাঁহারা বারাণসীতে বাস করিয়াছেন তাঁহারা চাগতাই দলভুক্ত।

আবাস-ভবন। বেনারস সহরে স্থপতি-বিদ্যার নানারূপ নমুনা দেখিতে পাওয়া যায়। ইষ্টকনির্ম্মিত সুবৃহৎ চৌতালা পাকবাটী হইতে আটতালা পর্য্যন্ত উচ্চ গৃহ আমাদিগের নয়নপথের পথিক হইয়া থাকে। এই বাসভবনের পুরোভাগ প্রস্তরফলক দ্বারা আবৃত। বাটীগুলি খুবই মজবুত। প্রথম তালায় পুরুষগণ, এবং দ্বিতলে অন্তঃপুর-পুরস্ত্রীগণ বাস করেন। রাস্তার সম্মুখবর্ত্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কামরাগুলিতে দোকানদারদিগের বাস। দোকানের সহিত ভিতরবাটীর আদৌ কোনো সংশ্রব নাই। এই তো গেল সহরের কথা। পল্লীগ্রামের বাটীগুলি কাঁচা, সম্মুখে প্রাঙ্গণ—তাহাও প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। বাটীগুলির ছাদ খোলামকুচি বা খড় দ্বারা আবৃত। তবে জমিদারদিগের ঘর দ্বিতল বা ত্রিতল এবং প্রকোষ্ঠগুলি সুবৃহৎ।

(ক্রমশঃ)

আমাদের কথা ঃ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

চন্দ্র। সমাজে শিক্ষার সংস্কার হলেই দ্বিতীয় কারণ দূরীভূত হতে পারে। আর অন্য শক্তির সহিত আমাদের অন্তঃপুরের সংস্রব হওয়ার সম্ভাবনা কি ?

হরি। সমাজের শিক্ষার যেরূপ আমূল সংস্কার হলে দ্বিতীয় কারণ দূরীভূত হতে পারে, সেরূপ সংস্কার বর্ত্তমানে এবং নিকট ভবিষ্যতেও অসম্ভব। তা কখনই পেরে উঠবেন না। আপনার Idealকে Realএ আনা মুখের কথা নয়। আজ সমাজের কি অবস্থা!—আর আগেই বা কি ছিল! আগে বিলাসিতা কতটুকু ছিল? প্রলোভন কতটুকু ছিল? আর এখন বাড়ীর চাকর পাচক পর্য্যন্ত টেড়ি কাটে, মেলদার পাঞ্জাবী গায়ে দেয়; মুচী চামারের মেয়েরাও তরল আলতা পায়ে দেয়, তাম্বুল-বিহার দিয়ে পাণ খায়! আগে পাঠ্য ছিল রামায়ণ, মহাভারত, পাঁচালী, পুঁথি; এখন নাটক নভেল, বিরহ, হা হুতাশ; আগে ছিল কথকতা, চণ্ডীর গান, রামায়ণ, পুরাণের যাত্রা; এখন প্রেমের থিয়েটার, বিলাসের অপেরা, নিধুবাবুর প্রেমের গান; আগে ছিল চুয়া, চন্দন, কুঙ্কুম, হরিদ্রা; এখন এসেন্স, পারফিউম্‌, সাবান, পাউডার; —আর কত বলব? আগে গ্রামের জমীদার শাল বা জামিয়ার গায়ে দিলে এবং তাঁহার গৃহিণী সোনার বাউটি পরলে, পাঁচখানা গাঁয়ের লোক তা দেখতে আসতো। আর আজ কি দেখচেন? ত্রিশ টাকা মাইনের "বাবু"র স্ত্রীর তোরঙ্গে একশিশি মেলখোস, একশিশি কুন্তলীন, অন্তত একখানাও পার্শী সাড়ী, একটা সিল্কের জ্যাকেট;—এ ছাড়া সুতোর ঢাকাই শান্তিপুরী তো দু পাঁচখানা আছেই। পেটে অন্ন না থাকতে পারে, কিন্তু এগুলি অপরিহার্য্য। আগে এ-গ্রামের লোক ও-গ্রামের লোককে চিনতো না, এখন আমরা মেয়ে-পুরুষে কাজের দায়ে দিল্লি-দিল্লী যাচ্ছি। কলকাতা, এলাহাবাদ, লাহোর, বম্বে, মাদ্রাজ ইত্যাদি তো এবাড়ী-ওবাড়ী হয়েছে;—তথাপি আপনি বলেন যে, অন্তঃপুরের সঙ্গে বাহ্য জগতের সাক্ষাৎ হবার সম্ভাবনা কি? এযে অনিবার্য্য, এবং আমাদের পরমমঙ্গলকর। অন্তঃপুরীকাদের খাঁচায় পুরে চোখ বেঁধে বগেজ করে এখানে-ওখানে নিয়ে যাওয়া এবং অবশিষ্ট সুন্দর খাঁচায় ঘেরাটোপ দিয়ে পুরে রেখে ছাতু দিয়ে "আত্মারাম" বলিয়া যাঁরা স্ত্রীজাতির উপর প্রভুত্ব রাখতে চান, সে-সকল চণ্ডালের মুখে আমি পদাঘাত করি! যাক্‌, যা বলছিলুম, —আগে আহারে ব্যবহারে যতটুকু সাত্ত্বিকতা ছিল, তা এখন কোথায়? আগের বিধবারা একান্নবর্ত্তী সংসারের

একপ্রকার কর্ত্রী হয়ে থাকতেন, এখন একান্নবর্ত্তী সংসার উঠে যাচ্ছে—দুদিন পরে একটিও থাকবে না। কেবল খবরের কাগজে আর্টিকেল্ লিখে কিছুই করতে পারবেন না—কালের গতি! তখন বিধবারা হয় নিরাশ্রয়া হবেন নতুবা ভ্রাতৃজায়া অথবা জা-এর ঝাঁটা খেয়ে একমুষ্টি অন্ন পাবেন। সেদিন নিকটবর্ত্তী,—অনেক স্থলে এসেছে। সেদিন আদালতে একটা পতিতা স্ত্রীলোক আসামী হয়ে এসে ডিপুটিবাবুর কাছে কেঁদে বল্লে, আশ্রয় অভাবেই তার কপাল পুড়েছিল। আহা সে ব্রাহ্মণের বালবিধবা! যাক্ সে কথা। তাই বলছি, এই সকল বিলাসিতার মধ্যে যে সকল বালিকা প্রতিপালিতা, বর্দ্ধিতা, যে সকল বালিকা পিতা বা ভ্রাতার সহিত থিয়েটারে যাচ্ছে, সার্কাস্ দেখছে, কত সখ্ করছে, কত দেশভ্রমণ করছে, পুস্তক ও সংবাদ পত্রাদি পাঠে এবং কতপ্রকার মানুষ ও দ্রব্যাদি দেখে কত শিখ্ছে, তারা যেই বিধবা হবে, অমনি পাষাণী হয়ে যাবে? ভেলকি বটে! আর বিধবা হওয়ার পরেও কি নিস্তার আছে? তখন কি এসকল দৃশ্য এবং উপকরণ তাদের চক্ষের সম্মুখ হতে উঠে যাবে? বিধবাদের সর্ব্বদা সধবাদের সঙ্গেই থাকতে হয়; কিন্তু সধবারা সর্ব্বদাই আজকাল রঙ্গ-রস, বেশবিন্যাস, বিলাস-বৈভব নিয়েই থাকেন। বিধবাদের সঙ্গে কিরূপে চলা উচিত এবং বিধবাদের কিরূপে রাখা উচিত তা আজকাল কয় জন সধবা জানেন বা ভেবে দেখেন? অনেক স্থলে কন্যা বা পুত্রবধূ বিধবা, কিন্তু মাতা বা শ্বশ্রূকে বিলক্ষণ ভোগ-বিলাস-পরায়ণ দেখা যায়। এসকল বর্ত্তমান অধঃপতন—পূর্ব্বে ছিল না। কারণ, পূর্ব্বে সমাজে বিলাসিতা ছিল না বল্লেই হয়। এখন স্ত্রীলোকেরা কুমারী ও সধবাবস্থায় ভোগ-বিলাসের চরম করে। —"আমি বিধবা হতে পারি, তখন কি হবে" ইহা ভেবে কেউ নিরস্ত থাকে না। অভিভাবকেরাও বাধা দেন না, বরং তাঁরাই স্ত্রীলোকের বিলাস-সম্ভোগ বাড়িয়েছেন এবং নিজেরা বিলাসী হয়েছেন। পূর্ব্বে এমন ছিল কি? আমি বেশ জানি, বাড়ীতে ভগ্নীপতি এলে বিধবা শ্যালিকার উপরেই অধিক কার্য্যের ভার পড়ে,—ভগ্নীকে "বরে দেওয়া", আর অন্যান্য সধবা সঙ্গিনীদের সঙ্গে মিশে "জাড়ি পাতা" এবং এই সকল প্রসঙ্গের সালঙ্কার সমালোচনা। ঠাট্টা-বিদ্রূপ তো অবারিত। এতে অনেক স্থলে অভিভাবকেরা বাধা দেওয়া অনুচিত এবং অনাবশ্যক মনে করেন। কেন না "ঠাট্টার সম্পর্ক"! এর মাঝখানেই আপনারা পবিত্র ব্রহ্মচর্য্য রক্ষিত করতে চান? পারেন ক্ষতি নেই,—তার চেয়ে সুখের কথা, পবিত্র কথা আর কি আছে? কিন্তু আজ কি দেখছি? প্রত্যেক সহরবাসী ক্ষুদ্র দোকানদার, মেঠাই-ওয়ালা, ফেরিওয়ালা, হোটেল্ওলা প্রভৃতি সকলেই এক একটি স্ত্রীলোক নিয়ে বাস করে! সেই সকল স্ত্রীলোক হিন্দুর বাল-

বিধবা হতে—আমাদের কাল্পনিক ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম হতে নেওয়া !! এক একজন অশিক্ষিত ভিক্ষা-ব্যবসায়ী কর্ত্তাভজার সঙ্গে সঙ্গে পাঁচজন করিয়া তিলক-ধারিণী বৈষ্ণবী টুকনি হাতে করে "জয় রাধে" বলে ফিরচে—সবই হিন্দুর বাল-বিধবা। এক একটি মেলায়, তীর্থস্থানে, যোগ-উপলক্ষে, সহস্র সহস্র হিন্দুর বিধবা ম্লান-ক্ষুধার্ত্ত মুখে ফিরচে—এবং অর্দ্ধেকের বেশি বাড়ী ফিরচে না। রূপের হাট তো গুলজার। এ-ছাড়া অসংখ্য ভ্রূণ-হত্যা ব্যভিচার সমাজের বুকের উপর তো অবাধেই চলেছে। এমন ডাক্তার খুব কমই আছেন, যাঁর জীবনে—হয় বাধ্য হয়ে, নয় অর্থলোভে দু পাঁচটা হিন্দু বাল-বিধবার ভ্রূণ-হত্যা করাতে হয় নেই। তাছাড়া অধিকাংশ স্থলে আনাড়ী লোকের ঔষধ ব্যবহারে কত বিধবা ছটফট করে ভ্রূণ সমেত প্রাণত্যাগ করছে! নরকের দৃশ্য! যাঁরা এসকল অস্বীকার করেন, হয় তাঁরা আজো মাতৃগর্ভে অর্থাৎ সমাজের কোনো খবর রাখেন না, নয় তো কোনো কারণে ইচ্ছা করেই চুপ করে থাকেন,—মামাকে চোখ ঠারেন। এই সকল দেখেই তো আজ বিলাতী সংবাদপত্রের সম্পাদকেরা আমাদের বিদ্রূপ করতে সাহস পান! নইলে পবিত্র হিন্দুর বিধবার নাম পর্য্যন্ত মুখে আনতে তাঁরা সম্ভ্রমে শিহরিয়ে উঠতেন। একদিন যাঁকে শরতের শিশির-বিধৌত শেফালিকার ন্যায় সমাজের ক্রোড়ে দেখে আমরা ভক্তিভরে গদ্গদ হয়েছিলুম, পাঁচ বৎসর পরে তাঁকে বাজারের মাঝখানে নরক-কুকুরের অঙ্কশায়িনী দেখচি;—সহস্র লম্পট-স্পৃষ্টা, উচ্ছিষ্টা, ঘৃণিতা; এবং কিছুদিন পরে ঘৃণিত রোগাক্রান্তা, অসহায়া, পদদলিতা, পরিত্যক্তা; অসংখ্য কৃমিকীট-দংশনে ছটফট করে মৃত্যুমুখে পতিত হতে দেখলুম! শৃগাল কুকুর, গৃধিনী, শকুনী, আজ সেই একদিনকার পবিত্র কোমলাঙ্গের গলিত মাংস ল'য়ে কাড়াকাড়ি করতে লাগলো! ক্রোধে নিজের হস্ত নিজেই দংশন করলুম! ক্ষোভে, দুঃখে, চক্ষু ফেটে তপ্তাশ্রু ছুটে এল! অনুসন্ধানে হয় তো জানলুম, কোনো বক-ধার্ম্মিক প্রতিবেশী অথবা আত্মীয় তাঁকে প্রলোভিত করে ঘরের বাহির করেছিল, শেষে অসহায় অবস্থায় অবলাকে এই ভয়াবহ ভবিষ্যতের জন্য ছেড়ে দিয়ে নিজে এসে আবার সমাজের বুকে বসে মহাবিজ্ঞ সেজে বিধবা-বিবাহের প্রতিবাদ করছে! এরা তো প্রতিবাদ করবেই!

চন্দ্র। তুমি বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ করলে দেখছি। সমাজে সব বাল-বিধবারই কি এই অধঃপতন, এই পরিণাম ঘটে? আর যে সকল লোক প্রতিবাদ করেন, তাঁদের সকলেই কি এই শ্রেণীর লোক? ছি ছি ছি! সামলে কথা বোলো।

(এই সময় আমার মনে বড় ইচ্ছা হইল যে, চন্দ্রবাবুর সেই পাতাসী নাপতিনীর কথাটা মনে করাইয়া দিই। সন্তোষ বাবুকে

জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি উত্তরে আমাকে বড় জোরে একটি চিম্‌টি কাটিলেন—বড় লাগিল, বলা হইল না। এদিকে হরিদাস বাবু উত্তর আরম্ভ করিয়াছেন।)

হরি। ঠিক তা নয়, সকলেই সেরূপ নয় তা অবশ্য জানি; কিন্তু যা আছে, তাই বা কেন থাকে? এটি যে সম্পূর্ণ আমাদেরই দোষে। হিন্দু রমণী দেবী। তাঁর চরিত্র মন কলুষিত করা অতি কঠিন। অল্প কষ্টে, অল্প প্রলোভনে, অল্প দুর্যোগে এবং অভিভাবক শ্রেণীর (যদি থাকে) অল্প অসাবধানতায় এবং তাচ্ছিল্যে হিন্দু রমণীর অধঃপতন অসম্ভব। কিন্তু তাও যখন সাধিত হচ্ছে, তখন বুঝতে হবে আমাদেরও সেই পরিমাণ অধঃপতন ঘটেছে। খবরের কাগজে রসান্‌-দেওয়া প্রবন্ধ লিখে বা দুখানা বাংলা "আদর্শ নভেল" লিখে কি করবেন? শাক দিয়ে মাছ কত ঢাকবেন? কাটা কান চুল দিয়ে কত ঢাকবেন?

চন্দ্র। আচ্ছা ভায়া, আর সব জাতির, যেমন মুসলমান খৃষ্টান ইত্যাদি—এদের তো বিধবা-বিবাহ আছে; কিন্তু এদের মধ্যে কি ব্যভিচার একেবারেই নেই?

হরি। আছে, কিন্তু আমাদের যা আছে তা যে অতি ভীষণ, দুরপনেয়; আমরা চেষ্টা করলে কখনই এতটা থাকত না। কারণ এদের আমাদের মত সমাজ-বন্ধন নেই, আমরা যদি সংশিক্ষার বলে সমাজে পবিত্রতা রক্ষা করে চলতে পারতুম, তবে আমাদের সমাজ আজ স্বর্গ হত, কারণ সমাজ আমাদের হাতে। তা যখন তেমন উচিতমত পেরে উঠি নি, তখন যদি আমরা এইসকল বাল-বিধবার পুনর্বিবাহের ব্যবস্থা করি, তা হলে পাঁচ বৎসর পরে আর বাজারে হিন্দুর কুলবধূকে লম্পটের অঙ্কশায়িনী দেখতে হবে না। দূরদর্শী পরমজ্ঞানী পরাশর ইহা জেনেই বালবিধবার পুনর্বিবাহের ব্যবস্থা করে রেখে গিয়েছেন। তিনি গাঁজাখোর ছিলেন না। এখন এই নিরপরাধিনী অবলা বালিকাদিগের প্রতি একটু দয়া প্রকাশ করলে মহাপাতক হবে বলে আমি মনে করি নে, এবং তাতে আমাদের বীরত্বেরও কিছু লাঘব হবে না।

চন্দ্র। ভীমরুলের চাকে একবার ঘা দিলে আর রক্ষা থাকবে না—তখন দেখতে পাবে।

হরি। বলেন কি! সমাজ যে আমাদের হাতে; বাড়াবাড়ি হতে কেন দেবো? আর বলেছি তো—অবিমিশ্র শুভ কিছুতেই পাবেন না। বর্ত্তমান অবস্থাতেই কি অবিমিশ্র শুভ আছে? বরং অমঙ্গলই খুব বেশি; আরো বাড়বে। এই দেখুন না কেন, কামার, কুমোর, ধোপা, নাপিত দেশ হতে লোপ পেতে বসেছে। একেই তো এদের ঘরে মেয়ে কম, তার মধ্য হতে বিধবা হতে থাকলে আর তাদের বংশরক্ষা কেমন করে চলে? এমন করে লোকসংখ্যা ক্ষয় পেলে যে সর্ব্বনাশ।

চন্দ্র। তুমি দেখছি Malthus এনে ফেল্লে? একে আমরা খেতে পাই নে; এর উপর লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া কি ভাল?

হরি। কেন খেতে পাব না? যারা খেতে পায় না, অর্থাৎ অনার্য্য জাতীয় হিন্দু এবং অনার্য্য জাতীয় (Converted) মুসলমান,—তাদের মধ্যে তো বিধবা-বিবাহ প্রচলিতই আছে। আর্য্য এবং বর্ণশঙ্কর হিন্দুর অবস্থা খুব খারাপ একথা কে বল্লে?

চন্দ্র। কিন্তু তারা, লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে তখন তো অবস্থা খারাপ নিশ্চয়ই হবে; লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়াই যে খারাপ।

হরি। কখনই না। Efficient population, অর্থাৎ লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যদি বর্দ্ধিত লোকসংখ্যা, আপন আপন জীবনযাপনের উপযোগী অর্থ উপার্জ্জন এবং শস্যাদি উৎপাদনের ক্ষমতাও লাভ করতে থাকে, এবং সমাজের বা দেশের স্কন্ধে burden (ভার) স্বরূপ না হয় তবে তো লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পরম মঙ্গলকর; কারণ তা হলে সমাজের বলবৃদ্ধি হয়।—একথা প্রফেসর মার্শাল্ তাঁর "Principles of economics" নামক সুবৃহৎ গ্রন্থে অতি সুন্দররূপে বুঝিয়েছেন। হিন্দুর লোকসংখ্যা বৃদ্ধি বর্ত্তমানে খারাপ একথা কোনো economist আমার কাছে প্রমাণ করতে পারেন না। বরং বিধবা-বিবাহ প্রচলিত না হলে হিন্দু-বংশ লোপ পাবারই কথা।

চন্দ্র। তা যেন হল। কিন্তু যখন হাঁসের পালের মত লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে সত্যসত্যই সমাজের বোঝা হয়ে দাঁড়াবে, তখন কি করবে?

হরি। তখন, আবশ্যক হলে, বিধবা-বিবাহ না হয় বন্ধই করব। সে তখনকার কথা তখন দেখা যাবে।

চন্দ্র। তখন তুমি কোথায় থাকবে? সে কি আর আজই হবে?

হরি। আমাদের বংশধরেরা করবে। সমাজে শিক্ষাবিস্তার আরম্ভ হয়েছে। আমাদের বংশধরেরা আমাদের অপেক্ষা অধিক জ্ঞানীই হবে। তারা সমাজ রক্ষা করতে জানবে এবং পারবে।

চন্দ্র। বিধবা-বিবাহ তারা কেমন করে বন্ধ করবে? একবার বাঁধ ভাঙিলে আবার কেমন করে গাঁথবে?

হরি। ঠিক গাঁথবে। সমাজ যে হাতের মুঠোর মধ্যে। সমাজের পণ্ডিতাগ্রগণ্যেরা যে বিধি-ব্যবস্থা করবেন, যে ব্যক্তি তা না মানবে সে যে সমাজচ্যুত হবে। এখন বিধবা-বিবাহ প্রভৃতি সমাজের পরমমঙ্গলকর সংস্কার সকল বন্ধ রেখেছেন কিসের জোরে? এই দেখুন না কেন, আগে তো বিধবা-বিবাহ, রমণীর স্বেচ্ছাবিহার, এসব ছিল; কিন্তু কালেতে তার অনেকগুলিই পাপ, বলে অভিহিত হয়েছে, এবং সেইজন্যই উহা নিষিদ্ধ হয়েছে। কিন্তু বন্ধ করলেন লাঠির জোরে, না সমাজ-শাসনের জোরে? কালভেদে ধর্ম্মভেদ অবশ্যই

হবে ; এবং তখনো এই সমাজশাসন-রূপ পেনাল্-কোডের সাহায্যেই আমরা তা সমাজ পালিত করাবো।

চন্দ্র। ভাল কথা মনে পড়ল,—গোলাপ শাস্ত্রী তাঁর Hindoo-Law তে (হিন্দু আইন) যে টিপ্পনিটুকু কেটে রেখেছেন, তা দেখেছ কি?

হরি। দেখেছি। তিনি এবিষয়ে একটু ভ্রান্ত। তিনি বলেন, বিধবা-বিবাহ আরম্ভ হলে, কুমারীর দল অবিবাহিতা থাকতে আরম্ভ করবে।—উদাহরণ বিলাত।

চন্দ্র। সে তো ঠিক কথা। ছোঁড়ারা বড় পেলে কি আর ছোট মেয়ে বিয়ে করবে?

হরি। আঃ সর্ব্বনাশ—কি বুঝলেন? বিলেতে সেজন্য কুমারীর সংখ্যা মোটেই বাড়ে নি—সেখানে কুমারীও বয়স্কা। সেখানে বিধবারা বিবাহ করলেও তাদের পূর্ব্ব স্বামীর সম্পত্তির অধিকারিণী থাকে, এই লোভেই অনেকে বিধবাকে বিবাহ করে। হিন্দু-আইনে তা পায় না, এজন্য লোকে বিধবা বিবাহ করতে কখনই তত প্রলুব্ধ হবে না। আর এক কথা,—হিন্দুর কাছে স্ত্রীর অতি পবিত্র আসন, সুতরাং কুমারীর আদর কোথাও যাবে না। অধিকন্তু আমরা অবশ্যই এবিষয়ে নিয়ম করব যে, কেবল মৃতদারই বিধবা-বিবাহ করতে পারবেন। যে কুমার বিধবা-বিবাহ করবেন অথবা যে অভিভাবক কুমারের সহিত বিধবার বিবাহ ঘটাবেন, তিনি সমাজচ্যুত হবেন।

চন্দ্র। শাস্ত্রী মশায় আরো বলেন, স্ত্রীলোকেরা রিপুদমন করতে পারে, এজন্য, সার্ব্বজনীন মঙ্গলের খাতিরে, তাঁদের ব্যক্তিগত স্বার্থ বিসর্জ্জন করাই উচিত।

হরি। প্রথমত, আমি এতক্ষণ যা বুঝিয়েছি, তাতে সার্ব্বজনীন মঙ্গল বিধবা-বিবাহ প্রবর্ত্তনে কখনই ক্ষতিগ্রস্ত হবে না;—বরং লাভবান হবে। দ্বিতীয়ত স্ত্রীলোকেরা রিপুদমন করতে পারে বটে, অনেক স্থলে য়ুরোপের চক্ষে নেটিভেরা যেমন না খেয়েও বাঁচতে পারে, আমাদের গুণধর পূর্ব্বপুরুষদের চক্ষেও তেমনি বিধবা হলে সহমরণের সময় আগুনের জ্বালা অনুভব না করেও পুড়ে মরতে পারে। হাত পা এবং মুখ বেঁধে আমার পিঠে বেত লাগালে আমি যেমন লক্ষ্মী শান্ত ছেলেটির মত নীরবে সহ্য করতে পারি,—অনেক ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকেরাও তেমনি পারে। আবার প্রফেসর সেন্দবী তো ঠিক উল্টো বলেন। তিনি বলেন যে, তারা যখন weaker sex, তখন সব বিষয়েই weak. কিন্তু কথা হচ্ছে এই যে, রিপুদমন করার কথা মেনে নিলেও, সমাজের পুরুষেরা কত স্বার্থপর ধর্ম্মাধর্ম্ম-জ্ঞান-শূন্য হয়েছে, তা জানেন? এ-ছাড়া এদেশে ঘরের দুয়ারে অহিন্দু জাত তো অসংখ্য আছে। গর্ত্তের সাপ খুঁচিয়ে বার করলে,—সাপের অপরাধ? উচ্চশিক্ষিত যুবকেরা ভাল বটে, কিন্তু তাদের সংখ্যা এত অল্প যে, নগণ্য বল্লেও

চলে। শাস্ত্রী মশায়ের রিপুদমনের প্রমাণ তো বাজার দেখলে, সমাজের গুপ্ত ব্যভিচারের অবারিত স্রোত দেখলে, খুবই পাওয়া যাচ্ছে দেখচি। যখন আন্তরিকতা ছিল, তখন ব্রহ্মচর্য্য চলত এবং তাতে পুণ্য ছিল। এখন আন্তরিকতাই যখন সমাজের দোষে গিয়েছে, তখন এ-প্রথা রাখা সম্পূর্ণ বিড়ম্বনা। আন্তরিকতা হারিয়ে যে প্রথা, যে ধর্ম্ম-কর্ম্মই বজায় রাখতে যাবেন, তারই ফল বিষময় হবে। আগে এমন দিন ছিল, যখন বিধবারা স্বেচ্ছায় সহমৃতা হতেন। কিন্তু যখন নারীরা সেই আন্তরিকতা হারালেন, তখন আপনারা তাঁদের বেঁধে জোর করে জীবন্ত পুড়িয়ে মারতে লাগলেন, এবং পাছে তাঁদের ভয়ের এবং মৃত্যু-যন্ত্রণার কাতর চীৎকার শুনতে হয়, এজন্য ঢাক-ঢোল বাজিয়ে আসর জমজমাট রাখতেন। উঃ কি নিষ্ঠুর বর্ব্বরতা! মনে করলেও গা শিউরে ওঠে! এই মহাপাপেই আজ আমরা এত অধঃপতিত।—পাপের ফল, নিরপরাধে নিষ্ঠুর স্ত্রী-হত্যার ফল, কোথায় যাবে? সভ্যতার অভিমান করতে লজ্জা করে না? এরই নাম পবিত্রতা! আন্তরিকতার বিরুদ্ধে সন্তান-ধনে বঞ্চিতা বাল-বিধবার ধর্ম্মানুমোদিত পুনর্বিবাহ বন্ধ রেখে, আবার আমরা সেই পাপসঞ্চয় করছি। এখনো সাবধান! আমি ব্রাহ্মণ—আমার সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হচ্ছে।—আমাদের অদৃষ্টে আরো কি আছে! ভরদ্বাজ ঋষির রক্ত এখনো এই শিরায় প্রবাহিত হচ্ছে,—আমি মূর্খ নহি। ভরদ্বাজ ঋষির মত রাজনীতি-বিশারদ কয়জন ছিলেন? আজো ভারতের নানাস্থানে এবং অনেক নেটিভ ষ্টেটে ভরদ্বাজ গোত্রীয়েরা মাথার পরিচয় দিচ্ছেন। আমার দূরদর্শিতা তুচ্ছ করবার নহে। মাথায় টিক রেখে আর খানিকটা ব্যাকরণ কাব্য পড়ে এক একটা আড়াই হাত সমাস-ওয়ালা টাইটেল ল্যাজে বাঁধলেই পণ্ডিত হয় না। কূটবুদ্ধি, ও দূরদর্শিতা, পৃথক জিনিষ। মাথায় হ্যাট পরেও তার অধিকারী হওয়া যায়। আগে সমাজে সংশিক্ষা বজায় রাখুন তারপর আদর্শ খাটাবার কথা বলবেন। নিজে স্ফূর্ত্তি করে বেড়াব,—যত আদর্শ এই অবলাদের ঘাড়ে। এঁদেরই গর্ভে না আমাদের জন্ম! এঁরা না আমাদের মা? আমরা মায়ের প্রতি নিষ্ঠুর নৃশংস! ফলও হাতে হাতে পাচ্ছি। এখনো সাবধান না হলে আরো ফলভোগ করতে হবে। আন্তরিকতাই ধর্ম্ম, নইলে সকল কর্ম্মই প্রতারণা এবং মহাপাপ। কার্লাইল্ গোঁড়া খৃষ্টান ছিলেন, তিনিও তাঁর বিখ্যাত "হিরো-ওয়ারশিপ্" গ্রন্থে লিখেছেন যে, যতদিন পৌত্তলিকতায় আন্তরিকতা থাকে, ততদিন উহা ধর্ম্ম, তারপর তাহা প্রহসন এবং মহাপাপ। যুগভেদে মানুষের ক্ষমতা এবং শিক্ষা-জ্ঞানাদিরও যেমন ভেদ হয়, তাদের ধর্ম্মকর্ম্মেরও তেমনি পরিবর্ত্তন হবে।

এখন কি আর সেই বৈদিক যজ্ঞ উপবাস পোষায়? তেমনি আমাদের ক্ষমতার সঙ্গে সঙ্গে আগে যেমন সতীদাহ ছিল, তারপর যেমন তা গিয়ে ব্রহ্মচর্য্য হল, তেমনি এখন শাস্ত্রানুমোদিত বিধি অনুসারে বাল-বিধবার পুনর্বিবাহই নিরাপদ। অস্বাভাবিকতার বিরুদ্ধে জোর করে সমাজকে রাখতে গিয়ে কেবল লোক হাসাচ্ছেন এবং সমাজের সর্ব্বনাশ করছেন। এ ছাড়া অন্তঃসলিলা ফল্গু নদীর ন্যায় যে নীরব তপ্তাশ্রু-প্রবাহ, কোমলহৃদয়া, নিরপরাধিনী, চিরদুঃখিনীদের মর্ম্মভেদ করে অহরহ প্রবাহিত হচ্ছে তা হিন্দু সমাজের উপর, হিন্দু পুরুষজাতির উপর দেবীর অভিসম্পাতের ন্যায় পতিত হচ্ছে,—তাই বুঝি হিন্দু আজ যায়-যায়, তাই বুঝি সমাজে পুরুষ সংখ্যা লোপ পাচ্ছে। তাঁদের সংবৃত দীর্ঘ নিশ্বাস প্রলয়ঝটিকার ন্যায় এই সমাজের মর্ম্মে আঘাত করছে। তাঁদের গুপ্ত মর্ম্ম-দাহ আগ্নেয় পর্ব্বতাভ্যন্তরের গুপ্ত বহ্নি-রাশির ন্যায় এই সমাজের কল্যাণরাশি দগ্ধ করছে। এতে ঘোর অমঙ্গল হবে। কেবল মস্তক নিয়েই (তার পরিচয়ই বা পাই কই?) মনুষ্যত্ব নহে—হৃদয় চাই। দয়ার সাগর বিদ্যাসাগরের তা ছিল। নইলে তাঁর কি স্বার্থ? তাঁর কয়টি বালবিধবা ভগ্নী বা কন্যার তিনি বিবাহ দিয়ে গিয়েছেন? কিন্তু তথাপি স্বীকার করছি, পুনর্বিবাহ অপেক্ষা ব্রহ্মচর্য্য সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ, এবং বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হলে অবিমিশ্র মঙ্গল পাবেন না—কোনো কার্য্যেই তা আশা করা যায় না। কিন্তু সমাজের বর্ত্তমান অবস্থার হিসেবে মঙ্গলই অনেক—অতএব এর বিপক্ষবাদী হওয়া হীনবুদ্ধি এবং হৃদয়হীনতারই পরিচায়ক।

চন্দ্র। খুব গালাগালি দেও তাতে কারো গায় আঁচ হবে না। কিন্তু গোলাপ শাস্ত্রী মশায়ের আপত্তি এখনো খণ্ডন করতে পার নি, কেবল বাচালের মত বকে যাচ্ছ আর বাক্‌পটুতা দেখাচ্ছ। যদি বিধবা-বিবাহ প্রচলিত না হয়, তবে যে সকল মৃতদার বিধবা-বিবাহ করবেন, তাঁরা কুমারীই অবশ্য বিবাহ করতেন—যেমন এখন করছেন। কিন্তু বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হলে, তখন এইসকল কুমারী তো surplus থেকে যাবে—কারণ তাদের দাবী বিধবারা এসে অধিকার করবে। তখন এই বাড়তি কুমারীগুলির কি গতি করবে?

হরি। বিধবা বিবাহ প্রচলিত না করলে ক্রমে কুমারীর সংখ্যা আরো বাড়বে। তখন বিধবা-বিবাহ বন্ধ থাকা সত্ত্বেও কুমারী অবিবাহিতা থাকবে - তার জোগাড় হয়ে এসেছে। আমরা তো কেবল যারা বিবাহের কিছুই জানে না—নিঃসন্তান, তাদেরকে পুনর্বিবাহ দিতে চাই, তাতেই আপনারা ক্ষুদ্র বুদ্ধি খোয়ায়ে ভবিষ্যতে কুমারী-বিবাহের দুর্গতি কল্পনা করছেন। কিন্তু মুসলমানদের তো নিঃসন্তান দূরের কথা, এক এক পাল ছেলে মেয়ে নিয়ে পুনর্ব্বার বিবাহ

করিয়াছেন; কিন্তু তাঁদের তো কুমারী বাড়ে নি? বরং তাঁদের মধ্যে একটি পাঁচ বৎসরের মেয়েও পড়তে পায় না। বিলেতের কথা পৃথক, সেখানে পুরুষেরা অনেকেই বেশি বয়সে বিয়ে করেন, কেউ বা আদৌ বিয়ে করেন না, কেউ বা বিদেশে বিয়ে করেন; স্ত্রীলোকেরাও অনেক বেশি বয়সে বিবাহ করেন, অনেকে আবার ইচ্ছা করেই কুমারী থাকেন; সেখানে মিশনারী ও "নাইটিঙ্গেল" দলকে "সিষ্টার" বলে 'সেন্সাস্' করা হয়, তাই দূর থেকে অমন দেখায়। আর ঐ অর্থলোভে বিধবা-বিবাহ তো আছেই—সে কথা আগেই বলেছি। বিশেষতঃ ওদেশে বিয়ে করা বড় হাঙ্গাম—বিবি পোষা না হাতী পোষা। এজন্য অনেকের বিয়ে হয় না। আমাদের দেশে সে ভয় নেই। সেখানে যেমন কুমারীও অনেক, তেমনি কুমারও অনেক। বিলেতের তুলনা কি এখানে খাটে? বরং বিধবা-বিবাহ বন্ধ রাখলে নিশ্চয়ই সমস্যা বাড়বে। এখানে দেবীবর ঘটকের কল্যাণেও অনেক স্থলে কুমারী বেশি দেখা যায়। কুমারীবৃদ্ধির জন্য বিধবা-বিবাহ দায়ী হবে না, বরং তা বন্ধ রাখাই বর্ত্তমানে দোষের হয়েছে। আর এওতো বড় মজা মন্দ নয় যে, কুমারী বাড়তে "পারে" এই আশঙ্কাতেই সোনার-চাঁদ মেয়েগুলোর ধর্ম্মানুমোদিত পুনর্বিবাহ হতে দেবো না! Utilitarian theory ধরে আমি যদি বলি, মেয়েগুলো বিধবা হলে তাদের বিষ খাইয়ে মারলে সমাজের সমস্যা আরো সহজ হয়। রাজপুতেরা তাই করে মেয়ে কমিয়েছিল, এ তো বিজ্ঞানসম্মত পরামর্শ। Darwin বলেন—"We have some reason to believe, that female-in-fanticide, consistently practised for along time, tends to make a male-producing race."—তাহি করতে বলি। আইনে না বাধলে বোধ হয় এ পরামর্শটাও দিতেন। যদি বিবাহের অযোগ্যা কুমারী surplus থাকে, তাতে ক্ষতি নেই। তাদের স্থলে উপযুক্ত বিধবার "মা" হওয়া উচিত। ও অসার কথা আর তুলবেন না, শুনলেও হাড় জ্বলে যায়। বিলেতের মত কুমারীবৃদ্ধি হয়েও যদি আমরা তাদের অর্দ্ধাংশও উপযুক্ততা লাভ করতে পারি সেও আমাদের মঙ্গল।

চন্দ্র। থাক্ ও সব বাজে কথা। শাস্ত্রের কথা ভেবে দেখ দেখি; যে কন্যাকে একবার দান করলুম, আবার তাকে দান করা কোন্ শাস্ত্রের অনুমোদিত?

হরি। সে কথা যদি বলেন তবে পুরুষদেরও বাদ দেবেন না। সে হিসেবে তর্করত্ন ঠাকুরদাদা চারটি বিবাহ করেছেন;—এখনো কি করেন বলা যায় না।

(তর্করত্ন ঠাকুরদাদা তাকিয়া ঠেস্ দিয়া নাসিকা গর্জ্জন সুরু করিয়াছিলেন, আমি তাঁর আজ্ঞা-মত পায়ে হাত বুলাইতে-ছিলাম। নিজের নাম উচ্চারিত হওয়ায় হঠাৎ ঘড়্ ঘড়্ ঘড়াৎ করিয়া নাক ডাকা

বন্ধ হইল। একদম্ উঠিয়া বসিয়া, বিস্ফারিত-নয়নে এদিক-ওদিক চাহিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন,—"পাতা হ'য়েছে নাকি ?" চারিদিকে হাসির রোল পড়িয়া গেল। সকলেই বুঝিলেন তর্করত্ন মহাশয় ফলাহারের স্বপ্ন দেখিতেছেন। একটা চেংড়া বামুনদের ছেলে একধার হইতে বলিয়া উঠিল—"ঝাঁটা বা'র হ'য়েছে—পাতা এখনি আসবে।" এতক্ষণে তর্করত্ন মহাশয়ের কল্পনা সন্ধ্যাজগতে ফিরিয়া আসিয়াছিল। তিনি সেই ছোঁড়াকে "দূর পাঁঠা" বলিয়া গালি দিয়া আবার তাকিয়া পরিগ্রহণ করিলেন। আমায় বলিলেন "একটু বাতাস কর।")

হরিদাসবাবু হাস্যসম্বরণ করিয়া, আবার আরম্ভ করিলেন—"দান করে ফিরিয়ে নেওয়া মহাপাপ সত্য। কিন্তু একটি কথা আছে,—একটি পবিত্র মনুষ্য-জীব—বিশেষতঃ পবিত্রতর নারীরত্ন—সামান্য টাকা-কড়ি, বাসন-কোসন, অথবা পাঁচ বিঘা জমির সহিত যে তুলনা করে, সে নর-প্রেত; তার সহিত আমার সম্বন্ধ নেই—আমি ব্রাহ্মণ। মানুষের অধিকারীত্ব এবং ইতর জীব বা জড়ের অধিকারীত্ব সমান কি ? আপনি কি আপনার কন্যা, পুত্র বা স্ত্রীকে খুন করতে পারেন ?—করলে, রাজদ্বারে এবং ধর্ম্মের কাছে কি আপনি অপরাধী হন না ? স্থাবর অস্থাবর কিছু আমাকে দান করলেন, আমি তা নিয়ে যা ইচ্ছে করতে পারি;—জলে ফেলে দিতে পারি, বিক্রয় করতে পারি, দান করতে পারি, কিনা করতে পারি ? কিন্তু আমার পূজনীয় শ্বশুর আমাকে যে কন্যাটি দান করেছেন, তাঁকে আমি কি করতে পারি ? আন্তরিক শ্রদ্ধা এবং সতত তাঁর সন্তোষবিধান, কল্যাণবিধান, এবং ধর্ম্মের সহায়তা ব্যতীত যদি আমি এক বিন্দুও তাঁর প্রতি অসদাচরণ করি, তবে আমি নরাধম, মহাপাপী। অতএব স্ত্রীলোক দান করার বেলায় "দান" কথাটা একটু বিশেষ করে সমঝে ব্যবহার করবেন। কিন্তু মনে করুন, আমার সহিত স্ত্রীর বিবাহের পরেই আমার মৃত্যু হল;—আমার সহিত তাঁর প্রণয় দৃঢ় হবার বা আদৌ হবার এবং সন্তান হবার পূর্ব্বেই আমি ইহধাম পরিত্যাগ করলুম। এখন যদি আমার দান-সূত্রে প্রাপ্ত অন্য পদার্থ কিছু থাকত, তবে আমার উত্তরাধিকারী তা ভোগ করত, কেউ না থাকলে সে জিনিস সরকারে নিলাম হত। কিন্তু মশায়, এই স্ত্রীটি কোন্ উত্তরাধিকারী "ভোগ" করবে ? অথবা কোন্ বাজারে নিলাম হবে ? যদি আমার সহিত প্রণয়ের খাতিরে অথবা ধর্ম্ম-জ্ঞানের বলে তিনি স্বতঃপ্রবৃত্তা হয়ে ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনে পিতৃকুলে অথবা শ্বশুরকুলে বাস করে' লোকসেবায় এবং ধর্ম্মচর্য্যায় জীবনাতিবাহিত করেন, তবে তো তিনি দেবী। কিন্তু এতে প্রথমতঃ শিক্ষাবলে তাঁর ধর্ম্মে মতি থাকা চাই, এবং দ্বিতীয়তঃ উত্তম আশ্রয় চাই,—কারণ আপনারাই বলেন, "ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি।"

এ সকলের অভাবে যদি তাঁর পিতা অথবা তদভাবে পিতৃস্থানীয় অন্য কেহ তাঁকে পাত্রান্তরে সম্প্রদান করেন, তবে তো বর্ত্তমান সমাজের অবস্থায় তা মঙ্গলজনক। নইলে ভয়ঙ্কর কুফল ফলবে। আর দান ফিরিয়েই বা নেওয়া হল কই? আপনাকে আমি দশটি টাকা দান করলুম, আপনি যদি পথের ধারে তা ফেলে রেখে সরে যান, তবে আমি যদি তা কুড়িয়ে নিয়ে পাত্রান্তরে দান করি,—তবে তাতে ফিরিয়ে নেওয়া হল কই? কিন্তু এ তো টাকাও নয় যে আপনি কাউকে দিয়ে যাবেন এতে আপনি ভিন্ন আর কেউ অধিকারী হতেই পারেন না। আপনি বেঁচে থাকতে যদি কেড়ে নিতুম, তবে সে পৃথক কথা। কিম্বা সন্তানহীনা বালবিধবা যদি স্বেচ্ছায় ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন করেন, সে তো উত্তম। জোর করে কেন? দড়ি বেশি টানলেই ছিঁড়বে, লেবু বেশি টিপলেই তেতো হবে।

চন্দ্র। তবে পুনর্বিবাহ-কালে কোন গোত্রের উল্লেখ করবে? সে যে প্রথম বিবাহের সময় প্রথম স্বামীর গোত্রে গিয়েছে।

হরি। এ সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মশায় যা বলে গিয়েছেন, তাই যথেষ্ট বলে মেনে নেওয়া উচিত ছিল। তথাপি তর্কবাগীশ প্রভৃতি কতকগুলি তথাকথিত পণ্ডিত, কত সব বাক্য আওড়িয়ে, বলেন যে, "গোত্র মানে বংশের পরিচয় বটে, কিন্তু necessarily বংশের কোনো আদি পুরুষের নাম নহে—যেমন কায়স্থদের গোত্র তাদের আদি পুরুষের পুরোহিতের নাম হতে হয়েছে। মেয়ের বিয়ের পর থেকে তার স্বামী-গোত্রেরই উল্লেখ হবে, কেননা এখন সে স্বামী-গোত্রে অধিষ্ঠিতা—"কুলং জনপদে গোত্রে"—ইত্যমরঃ। যদিও তার জন্ম ভিন্ন গোত্রে। অতএব গোত্র মানে যে-কুলে স্থিতা বা আশ্রিতা। যে-কুলে জন্ম তা necessarily গোত্র নহে। যেমন দত্তক পুত্র জন্মদাতার গোত্রের উল্লেখ করবে না, পালনকর্ত্তারই গোত্রের উল্লেখ করবে—কেননা সে ঐ কুলে অবস্থিত। আরো অনেক নজির (হিন্দু শাস্ত্রে কোনো কাজের জন্যই নজিরের তো অভাব হয় না) দেখিয়ে তাঁরা মোটের উপর এই কথাই বলতে চান। কিন্তু আমি বলি এই যে, বিবাহিতা কন্যার সঙ্গে দত্তকপুত্রের তুলনাটা নাই বা করলুম? পোষ্যপুত্রের বাপের নাম জিজ্ঞাসা করলে, সে কার নাম বলবে? কিন্তু বিবাহিতা কন্যাও কি বিবাহের পর বাপের নাম ভাঁড়াবে? যে আপন পুত্রকে দত্তকপুত্র-রূপে দান অথবা বিক্রয় করল, সে যে আপনার পিতৃত্ব ত্যাগ করল, এবং সেই পুত্র ক্রেতার পুত্র হল—"পুত্রের মত" হল না। সে ছেলে এখন হতে বাপের নাম ভাঁড়াবে। কিন্তু কন্যার পিতা কখনই কন্যাদান-কালে পিতৃত্ব পরিত্যাগ করেন না, এবং কন্যাও শ্বশুরের পুত্রবধূ অর্থাৎ "কন্যার

দত্ত" হয়, "কন্যা" হয় না; বাপের নামও ছাড়ায় না, বাপের সঙ্গে সম্বন্ধ, স্নেহ মমতা, কিছুই ত্যাগ করে না। কিন্তু জন্মদাতার সহিত দত্তকপুত্রের কোনো সম্বন্ধই থাকল না। পিতা মরলে কন্যা শৌচগ্রহণ করবে এবং চতুর্থ দিবসে শ্রাদ্ধ করবে, কন্যার পুত্র কন্যার পিতার শ্রাদ্ধাধিকারী এবং সম্পত্তির উত্তরাধিকারী—শাস্ত্রে তাঁর পুত্র অতএব। কিন্তু দত্তকপুত্রের সঙ্গে জন্মদাতার এসকল সম্বন্ধ কোথায়? আর একটি কথা;—সগোত্রে বিবাহ বিজ্ঞানও নিষেধ করবে। হিন্দুরা জ্ঞানবলে তা জেনেই ইহা নিষেধ করে গিয়েছেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রী প্রবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

কার্য্যস্রোত।

কার্য্য-কারণের স্রোত বহিয়াছে নিশিদিন;
দাঁড়ায়ে স্রোত তব মুখে বৃথা কি ভাবিছ তৃণ?
শুধু দুদিনের খেলা—দু'দিনের পরিচয়,
দু'দিনে ফুরায়ে যাবে দু'দিনের অভিনয়!
ব্যাকুল, জেনো তাহা জটিল এ বিশ্বজালে,
কখন পড়িবে ধরা কে জানে কিসের ছলে!
একি শুধু আসা-যাওয়া? মানে নাকো কর্ম্মফল
জড়ত্বে জড়ত্বগামী মনুষ্যত্বে আনে বল!
বিশ্বাসী, বিশ্বাস রাখ হো'ক না যতই ছোট,
কিছুই হবেনা ধ্বংস—তবে এক সাথে জোট;
লয়ে অণু পরমাণু, লয়ে ক্ষুদ্র বালু কণা,
মহান্ পর্ব্বত কত ধরা-'পরে জান কিনা?
সবই যদি নশ্বর সবই যদি মহীয়ান,
তবে কেন তুমি শুধু পড়ে রবে অবসান?
শুধু কর্ম্ম করি চল চেয়োনাকো কর্ম্মফল;
কর্ম্মক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া হারায়ে ফেলনা বল।
বিপদে সম্পদে মূঢ় কেন হও আত্মহারা?
পিছনে দেখো না ফিরে আগু হয়ে চল ত্বরা।
আঁধার ঘনায়ে আসে এখ'ন আসিবে নিশি;
অসমাপ্ত কার্য্য রেখে যেয়োনাকো হে বিশ্বাসী।

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী।

আদেশ পালন।

(গল্প)

প্রতিবেশীরা সকলেই স্বীকার করিত যে ভাইলালজী রূপে গুণে এবং বুদ্ধিমত্তায় গ্রামস্থ যুবকবৃন্দের অগ্রগণ্য ব্যক্তি। পরস্পরার ব্যাপকতা ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিল এবং অল্পদিনের মধ্যেই গ্রামের মাতব্বর, সম্পদশালী বৃদ্ধ পঞ্চায়েতের

সুনজরে পড়ায়, চারিদিক হইতে ভাইলালের সম্ভ্রম ও সম্মান অত্যন্ত বাড়িয়া গেল। পঞ্চায়েতের পরামর্শে মন্ত্রী, এবং কার্গো দক্ষিণ হস্ত বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়া ভাইলাল দশজনের একজন হইয়া দাঁড়াইল।

মানবের ভাগ্য-গগনে সৌভাগ্যের সূর্য্য যখন পূর্ণতেজে জ্বলিয়া উঠে তখন মানুষের বড় ভয়ঙ্কর সময়, কারণ তাহার তেজে কেহ বা উজ্জ্বল জ্যোতিষ্মান হইয়া উঠে, কেহ বা ঝলসাইয়া পুড়িয়া মরে; কিন্তু দুই অবস্থার যেটাই আসুক, কোনোটাই নিস্তরঙ্গ চাঞ্চল্যহীন নয়, দুই-ই প্রখর উদ্দামতা-পূর্ণ! অনভিজ্ঞতার অপযশে চিত্তদাহ যতই তীব্র হউক, মানুষ তাহা সামলাইতে পারে; কিন্তু অভিজ্ঞতার সুযশে অনেক সময় শান্ত-প্রকৃতি লোকেরও মস্তিষ্ক সাংঘাতিক রকম বিচলিত হয়, এবং তাহার পরিণামও বিশেষ সুবিধাজনক বলিয়া বিবেচিত হয় না।

গ্রামের মধ্যবিত্ত গৃহস্থ প্রভু রাওয়ের কন্যার সহিত ভাইলালের বিবাহের সমস্তই পাকাপাকি ঠিকঠাক, এমন কি বিবাহের দিন পর্য্যন্ত স্থির হইয়া গিয়াছিল, এমন সময় সকলে একদিন হঠাৎ শুনিল যে, বিবাহ হইবে না!

"কেন?"—এই 'কেন' প্রশ্নটার সদুত্তর অনেক সময় ঠিকরূপে ব্যক্ত হয় না;—বিকৃত মূর্ত্তিতে রূপান্তরিত হইতেও দেখা যায়। পাড়ার লোকেরা অনেক মাথা ঘামাইয়া বিস্তর দুশ্চিন্তার পর স্থির করিল "বরের কন্যা পছন্দ নহে", এবং মেয়ে-মহলে জনান্তিকের মধ্য দিয়া একটা গোপন রহস্য প্রচার হইয়া গেল যে ....।

কেবল পাড়ার বৃদ্ধ বন্দ্যোজী বিশস্ত-সূত্রে অবগত হইলেন যে কোনো কারণ না থাকা সত্ত্বেও ভাইলাল বিবাহ করিতে নারাজ। শুধু প্রভু রাওয়ের কন্যা বলিয়া নহে, সে কাহাকেও বিবাহ করিবে না। এবং ইহার প্রতিবাদে সে আত্মীয় বন্ধু সকলেরই যুক্তি তর্কের উত্তরে শুধু নিঃশব্দে মাথা নাড়িয়াছে, বিবাহ সে করিবে না, কিছুতেই না———!

আশাভঙ্গে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত প্রভু রাও বয়স্থা কন্যাটির সদ্গতির জন্য, আবার নূতন করিয়া পাত্রের সন্ধানে মনোনিবেশ করিলেন। কিন্তু পাত্র মেলা যে দুর্ঘট।

বিশেষতঃ কনকাঙ্গ মেয়েটি নিতান্ত ছোট নহে; বাল্য-বিবাহ-প্রচলিত মহারাষ্ট্র সমাজের নিয়মানুসারে ধরিতে গেলে তাহার বিবাহের বয়স উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। ভাইলালের ভরসায় তাহার পিতা মাতা এ পর্য্যন্ত পরম নিশ্চিন্ত ছিলেন, এমন সময় ভাইলাল হঠাৎ বাঁকিয়া বসায়, একটা মস্ত গোলযোগ বাধিয়া গেল। সকলের কাছেই ব্যাপারটা কুহেলিকাচ্ছন্ন নিগূঢ় রহস্য বলিয়া প্রতীয়মান হইল। এ বড় আশ্চর্য্য!

শৈশব হইতে একই জল-বায়ুর ভিতর দিয়া উভয়ের জীবন গঠিত বলিয়া,—প্রভু রাওয়ের হিতৈষীবর্গ ভাইলালকে খুব

বেশী রকম চাপাচাপি করিতেও ছাড়িলেন না। কিন্তু ফল কিছুমাত্র সন্তোষজনক হইল না। লোকটা সমস্ত অনুরোধ উপরোধ অগ্রাহ্য করিয়া সমানে তাল ঠুকিল। হিতৈষীরা হাল ছাড়িলেন, বিজ্ঞের দল মাথা নাড়িয়া বলিলেন,—"কিছু বোঝা যাচ্ছে না। ———"

দেখিতে দেখিতে কয়েক মাস কাটিয়া গেল।

২

সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে।

ভুঁইয়াদের পাথরের বাঁধা ঘাটে পৈঁঠার উপর কতকগুলা ভিজা কাপড় স্তূপীকৃত করিয়া রাখিয়া, জলের ভিতর গলা পর্য্যন্ত ডুবাইয়া কনক অন্যমনস্কভাবে, হাত পা রগড়াইতেছে। সন্ধ্যা সমাগমের বহু পূর্ব্বেই ঘাটের যাত্রীরা আপন আপন কর্ম্ম সারিয়া চলিয়া গেল। নির্জ্জন ঘাটে একা রহিল কনক।

অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল, কনকের তবুও উঠিবার তাড়া নাই। সারাদিনের গ্রীষ্ম গুমোটের পর এখন সদয় হইয়া সান্ধ্য সমীরণ মৃদু হিল্লোলে মধুরভাবে নাচিয়া নাচিয়া বেড়াইতেছে। সেই সুখময় স্নিগ্ধ স্পর্শে বালিকার প্রাণের অতীতের কত সুমধুর স্মৃতিকে জাগাইয়া, কত পুরা-তন—দূরস্থকে নূতন—নিকটস্থ করিয়া আনিতেছে, কতদিনের কত অস্পষ্ট চিত্র উজ্জ্বল বর্ণে রঞ্জিত করিয়া মনের চোখের সামনে আনিয়া ধরিতেছে, তাহার ঠিকানা নাই! মৃদুমন্দ ফুরফুরে হাওয়া সারা প্রাণটাকে কেমন এক অজ্ঞাত মত্ততায় বিহ্বল করিয়া তুলিয়াছে। কনক অন্যমনস্ক—বড় অন্যমনস্ক!

আহা কতদিনের কত হর্ষ-পুলক-ভরা মধুময় স্মৃতি সৌরভ-জড়িত, ভুঁইয়াদের এই বাগান, এই পাথর-বাঁধা ঘাট, কত নিস্তব্ধ নির্জ্জন দ্বিপহরে এই তরুচ্ছায়াচ্ছন্ন ঘাটে বসিয়া ভাইলাল তাহার সাধের বাঁশীটিতে মধুর তান ধরিয়া, স্বর-লহরীর কম্পন ক্রীড়নে, পাড়ার ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের কত বিমোহিত করিয়া তুলিয়াছে। দিগন্ত-বিস্তৃত ঐ প্রান্তরে, কৌমুদী-কিরণ-প্লাবিত কত মধুর যামিনীতে সুকণ্ঠ ভাইলাল চিত্তদ্রবকারী সঙ্গীতে, নিপুণ সুর ঝঙ্কার তুলিয়া শৈশব সঙ্গীদের তরল মস্তিষ্কে কতদিন কত নব নব আবেগের সঞ্চার করিয়াছে! কত অন্ধকার রাতে 'পুন্নাগ' তৈলের দীপো-জ্জ্বল কক্ষে, গায়ে গায়ে ঘেঁসাঘেঁসি ভাবে উপবিষ্ট, গল্পশ্রবণোৎসুক পাড়ার ছেলের দলকে, ভাইলাল কত ঝড় বৃষ্টি বজ্রঝঞ্ঝনা-মুখরিত কত বিদ্যুৎ-চমকিত ঘটনা বৈচিত্র্য-রঞ্জিত কাহিনীর,—কত দৈত্য, দানা, ভূত-প্রেত-সমাচ্ছন্ন আখ্যায়িকার অদ্ভুত আজগুবী বর্ণনা-চাতুর্য্যে ভয় বিস্ময় ও আনন্দ উত্তেজনায় মাতাইয়া তুলিয়াছে; আজ এখন আর কে তাহার হিসাব দিতে পারে? সেই একদিন গিয়াছে,—আর এই একদিন চলিতেছে।

মানুষের নির্দ্দয়তার বহরের সহিত

আকাশের অসীমত্তার পরিমাপ করিবার জন্যই বোধ হয় কনক আকাশের দিকে চাহিয়া চাহিয়া ভাবিতেছিল। অতীতকে আজ যেন অদৃষ্টের একটা বজ্রকঢ় পরিহাস বলিয়া মনে হইল! কনকের সারা বুকটা আলোড়িত করিয়া একটা মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাস, অন্তরের গোপন গুহা হইতে আর্তনাদ করিয়া বাহির হইয়া অলক্ষ্যে বায়ু-স্তরে মিলাইয়া গেল।

সন্ধ্যার আঁধার যখন খুব ঘনাইয়া আসিল, তখন কনকের চমক ভাঙ্গিল, তাড়াতাড়ি উঠিয়া লজ্জিত লাবণ্য-সুন্দর যৌবন-বিকশিত অঙ্গের, ক্ষীণ তনুলতায় সিক্ত বস্ত্র নিংড়াইয়া জড়াইল। পৈঠার উপরকার কাপড়খানায় অঞ্জলি অঞ্জলি জল সিঞ্চন করিয়া, সেগুলা আবার জলে ডুবাইয়া নিংড়াইয়া কাঁধে ফেলিল; তার পর কঠিন পাষাণের উপর জলসিক্ত চরণের কোমল কমনীয় রেখা অঙ্কিত করিয়া, সোপান বাহিয়া উপরে উঠিল।

ঘাটের উপর লতামণ্ডপ। লতামণ্ডপের বাহিরে, রাস্তার ধারে একটা গাছের গুঁড়িতে ডান পা তুলিয়া, এক ব্যক্তি বিপরীত দিকে মুখ ফিরাইয়া শিস্ দিতেছিল, বোধ হয় তাহার ঘাটে নামিবার প্রয়োজন আছে, স্ত্রীলোক ছিল বলিয়া এতক্ষণ নামিতে পারে নাই, এখানে অপেক্ষা করিতেছে।

বামপার্শ্বে চরণক্ষেপে আহত, সিক্ত বস্ত্রের শব্দ-সংঘাতে আকৃষ্টচিত্ত লোকটি ফিরিয়া তাকাইল। চকিতে দৃষ্টি-বিনিময়ে, বিভ্রান্ত-দৃষ্টের ন্যায় চমকিয়া কনক দাঁড়াইল। উভয়েই স্তব্ধ বিস্মিত!

লোকটি ভাইলাল।

চকিতে কাঁধের উপর হইতে ভিজা কাপড়গুলা টানিয়া থর-কম্পিত বুকের কাছে প্রাণপণে গুটাইয়া ধরিয়া, লতা-মণ্ডপের পাশে ভর দিয়া—একটু হেলিয়া কনক দাঁড়াইল! কি সুন্দর মৃদু বঙ্কিম ভঙ্গী! সৌন্দর্য্য মুগ্ধ লালসালুব্ধ ভাইলাল বিস্ফারিত-নয়নে সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোকের নীচে, চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল! উদ্দাম আকাঙ্ক্ষার প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা বায়ু নিমেষে তাহার চিত্ত-সাগরে তাণ্ডব নৃত্য জুড়িয়া দিল!

"ভাইলাল, তুমি! ক্ষমা কর, তোমায় একটি কথা বলবার ইচ্ছা আছে, দেখা পাইনি এদিন, তাই বলতে পারি নি,—আজ এখন—" একটু ইতস্তত করিয়া ধীরভাবে কনক বলিল, "বলব কি ভাইলাল আজ?"

একটা অবাক্ত বেদন ভাইলালের অন্তরটা মর্ম্মন্তুদ নিষ্পেষণে নিঃশব্দে গুঁড়াইয়া ফেলিল! বাধাবিহ্বল ভাইলাল একটি কথাও বলিতে পারিল না! স্তব্ধ ভাবে রহিল! তাহাকে নীরব দেখিয়া ঈষৎ আহত ভাবে কনক বলিয়া উঠিল, "তুমি অন্য কিছু ভেবো না আমি অন্য সম্বন্ধে তোমায় কিছু অনুরোধ করতে আসিনি, আমি তোমার জন্যেই তোমায় কিছু বলতে চাই—"

কুণ্ঠিত স্বরে ভাইলাল ক্লিষ্টস্বরে বলিল, "কি ?"—বেশী ব'লতে পারিল না।

নম্রকোমলকণ্ঠে কনক ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল—"জানি, এ কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করার চেয়ে না করাই ভাল, তবু জিজ্ঞাসা করচি ভাইলাল, মার্জ্জনা কর, সত্যি করে বল ভাইলাল—" কনকের কণ্ঠ শুকাইয়া আসিয়াছিল, সে থামিল! আরক্তমুখে একবার রক্তকিরণাভামণ্ডিত অস্তগামী সূর্য্যের লুপ্তপ্রায় শেষ রশ্মিটুকুর পানে চাহিল! তখনো দিক্ চক্রবালের ক্ষীণ উজ্জ্বলতাটুকু সন্ধ্যা রাক্ষসীর গাঢ় মলিনতার মাঝে ঢাকিয়া ফেলিতে, একটু—অতি সামান্য একটু দেরি আছে। কনক কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া নতদৃষ্টিতে বলিল,—"সত্যি করে বল ভাইলাল, তোমার চরিত্র—"

আতঙ্কশঙ্কিত ভাইলাল জোর ক'রিয়া বিদ্রূপের হাসি টানিয়া, অর্দ্ধসমাপ্ত কথাটা অসম্পূর্ণ রাখিবার জন্য তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল,—"পাগল কনু পাগল!—তুমি কার কাছে এসব গুলিখোরী গল্প শুনেছ ?"

তীব্র-তেজ-বর্ষী স্থির দৃষ্টি ভাইলালের চোখের উপর ন্যস্ত করিয়া, ধীরস্বরে কনক বলিল,—"কারু কথা বিশ্বাস করি নে ভাইলাল, শুনি মাত্র, সংসারে তোমার ওপর,—শুধু তোমার ওপর আমার অটল বিশ্বাস। তাই তোমায় জিজ্ঞাসা করচি, তুমিই বল—সত্যি বল ভাইলাল যা শুনি তা সবই কি মিথ্যে ?"

সে জ্বালাময় দৃষ্টির সাম্‌নে ভাইলাল যেন ঝলসাইয়া পুড়িয়া মরিল, তাহার শ্বাস-রোধের উপক্রম হইল, বিবর্ণমুখে হতবাক্ হতবুদ্ধির মত সে নতশিরে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার চক্ষু তুলিবার সাহস হইল না!

তাহাকে নীরব দেখিয়া গভীর ক্ষুব্ধস্বরে কনক বলিয়া উঠিল,—"আমি তোমার কেউ নই ভাইলাল, তোমায় কোনো কথা বলবার অধিকার আমি জগতের কাছে পাই নি, কিন্তু তবু ভাইলাল, আমি, তোমার চিরমঙ্গলপ্রার্থিনী শৈশব সঙ্গিনী, তাই আজ তোমারই অন্যায়ের জন্য তোমায় সতর্ক করতে এসেছি; এতে হয় তো আমি নিজের সীমা লঙ্ঘন করে চলেছি, কিন্তু সেও তোমার কাছে,—তুমি আমার সে ত্রুটী ক্ষমা কোরো ভাইলাল, ভাল হোক মন্দ হোক, আমি সত্যটা জানতে চাই।"

কনক একটু থামিয়া আবার বলিতে লাগিল,—"উপেক্ষার নির্ম্মম কশাঘাত অগ্রাহ্য করে, অপমানের পশরা মাথায় বয়ে নির্লজ্জা আমি, তোমার কাছে আজ অনেক দিনের পর সেই পুরোনো কনক হয়ে এসে দাঁড়িয়েছি; বড় সঙ্কোচ হয়েই এসেছি, এ যদি তোমার মঙ্গল উন্নতির সংবাদ হোত, তা হলে সঙ্কোচ ত চিরদিনের জন্য তোমার দৃষ্টির সামনার বাইরে-ই থাকতুম, আর জীবনে ফিরেও তাকাতুম না!—"

বজ্রাহত অভিমানভরা মর্ম্মস্পর্শী

মনোরম স্বর! মুহ্যমান ভাইলালের আপদমস্তকে প্রখর অগ্নিশিখা প্রবাহিত হইতে লাগিল। দুই মুহূর্ত্ত উত্তর-প্রত্যাশায় নীরব থাকিয়া সহসা মর্ম্মভেদী নৈরাশ্যে, যন্ত্রণা-উচ্ছসিত-কণ্ঠে কনক বলিয়া উঠিল, "জানি ভাইলাল, তোমায় এ প্রশ্ন করবার অনেক আগেই জানি, তুমি এ কথার জবাব দিতে পারবে না।—"

মুহূর্ত্তে দুটি হৃদয়ের শান্ত ধমনীতে, বহ্নিময় মহাবজ্র বিস্ফুরিত হইয়া প্রলয়ের করাল দুন্দুভি বাজাইয়া তুলিল! বহির্জগত আতঙ্কে আড়ষ্ট।

কিয়ংক্ষণ পরে একটু সামলাইয়া উপস্থিত তেজকে সবলে সংহত করিয়া, ধীরে ধীরে—অতি ধীরে কনক আবার বলিল,—"তুমি অন্ধ, তাই বুঝ্‌ছ না ভাইলাল, কিন্তু এর পরিণাম বড় ভয়ানক হবে, এখনো ফেরো ভাইলাল, এখনো ফেরো, আমার কথা রাখ্‌তে চেষ্টা কোরো, লক্ষীছাড়া নেশায় আত্মহারা হয়ে, নিজের সর্ব্বনাশ—সেই নির্ব্বোধ বিধবার সর্ব্বনাশ কোরো না,—"

"কে সে?" কলঙ্কপঙ্কিল, জীবনের দীপ্তসত্যের গ্লানি, বুঝি মৃত্যুভীতির অপেক্ষাও বেশী যন্ত্রণাদায়ক, বেশী বিভীষিকাময়! তাই মৃত্যুর মুখেও মরিয়া হইয়া ভাইলাল মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল, অস্থিম শক্তিতে বলিল, "কার কথা বল্‌ছ, কে সে?"

ঘৃণার স্বরে কনক বলিল,—"কে সে! প্রবঞ্চক তুমি, জান না কে সে? তোমাদের পঞ্চায়েতের বিধবা যুবতী কন্যা।"

ত্রাসব্যাকুল ভাইলাল বলিয়া উঠিল,—"মিথ্যা মিথ্যা মিথ্যা, এ সব যে বলেছে সে মিথ্যাবাদী।"

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কনক ভাইলালের মুখের দিকে দুই মুহূর্ত্ত তাকাইয়া রহিল; তার পর তীব্রকঠিন স্বরে বলিল, "অন্যে যদি এ-রকম মিথ্যে বলতো, তবে তার মুখের ওপর থাবড়া দিয়ে চলে আসতুম, তুমিও আমায় প্রবঞ্চনা কর্‌লে ভাইলাল, ছিঃ! তোমার মুখ চোখ সবাই তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিচ্ছে, তবু তুমি আমায় পরিষ্কার বোঝাতে চাও ভাইলাল, বেশ!"

বেগে মুখ ফিরাইয়া কনক দ্রুতপদে ফিরিয়া চলিল। তাহার মুখ হইতে শেষ কথা ভাইলাল শুনিল—"তবু পার তো এখনো ফের্‌বার চেষ্টা কোরো।"

৩

আবার আগেকার মতই সন্ধ্যা সকাল যথাক্রমে অতিবাহিত হইতে লাগিল।

ক্রমশ দেখা গেল যে, পঞ্চায়েত-পরিবারের একটা কলঙ্ক-কালিমা-জড়িত অস্ফুট গুঞ্জন, গ্রামের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত মৃদুস্বরে ধ্বনিত হইতেছে। বর্ষীয়সীদিগের পর-চর্চ্চায়, মধ্য-বয়স্কাদিগের হাস্য-পরিহাসে, চরিত্রহীন নিষ্কর্ম্মা নর-নারীগণের অশ্লীল কুৎসা-কৌতুকে, ইতর সাধারণের অনাবশ্যক বাক্য-প্রাবল্যে, কথাটা 'কানা ঘুসার' মধ্য দিয়াই চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

সম্ভ্রান্ত ঘরের গুপ্ত তত্ত্ব ব্যক্ত করিবার এবং তাহা লইয়া গ্লানি আন্দোলন করিবার লোকের অভাব নাই। তাহার উপর সংসারে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে, অন্তরে-বাহিরে সতত্র সৌহৃদ্য থাকিলেও অসচ্চরিত্র ব্যক্তিগণ কার্য্যক্ষেত্রে ঈর্ষাবশে প্রায়ই পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বীতা করিতে আরম্ভ করিয়া আততায়ী পর্য্যন্ত হইয়া দাঁড়ায়। এ জগতে বিধাতার অমোঘ বিধান চিরদিনই অলঙ্ঘ্য। অন্যায়ের উপর যাহার প্রতিষ্ঠা, ন্যায়ের নিঃশ্বাসে তাহার পতন অনিবার্য্য। অধর্ম্মের মেঘের অন্তরালে যাহার জীবন, ধর্ম্মের বিদ্যুৎবিকাশে তাহার মরণ অবশ্যম্ভাবী।

উপস্থিত ক্ষেত্রেও তাই ঘটিল। বিপুল বৈভবশালী, গ্রামের মস্তক-স্বরূপ, পঞ্চায়েতের স্ব-ইচ্ছা-সম্পন্না, স্বাধীনা বিলাসিনী কন্যার উপাসক জুটিয়াছিল ঢের, কাজেই বিপদের গুরুত্বও বেশী।

বৃদ্ধ পঞ্চায়েত নিরীহ নির্ব্বোধ গোবেচারা ধরণের মানুষ, অধীনস্থ কাহাকেও হাতে পাইলে চোখ রাঙ্গাইয়া, হাক ডাক করিবার যতই ক্ষমতা তাঁহার থাকুক না কেন, সংসারের কুটিল মার-প্যাঁচের মধ্যে মাথা গলাইবার সাধ্য তাঁহার ছিল না। সারা গ্রামটার শৃঙ্খলাসাধনের জন্য তাঁহার সমস্ত বুদ্ধিশক্তি নিঃশেষিত হইয়াছিল বলিয়া, পৃথিবীর অন্য কোনো কিছু খবর তাঁহার কাছে পৌঁছিবার অবকাশ পাইত না! দৈবাৎ বাতাসের স্রোতে ভাসিয়া আসিয়া কোনো কথা কানে ঢুকিলেও প্রাণে ঠাঁই পাইত না। আর মুখোমুখি স্পষ্টাক্ষরে তাঁহাকে কিছু বলিতে পারে, এমন খিশির-বিশিষ্ট দুঃসাহসী জীব সে গ্রামে তখনো জন্ম-গ্রহণ করে নাই।

অসৎ-পথের আকর্ষণও যেমন তীব্র, বিরক্তি ও অবসাদও ততোধিক তীব্র! অল্পদিনের মধ্যেই সমস্ত জগতটা ভাইলালের কাছে তীক্ষ্ণ কটু বিস্বাদের আবহাওয়ায় ভরিয়া গেল। কুহকের মোহ পাশ হইতে আপনাকে ছিনাইয়া লইবার জন্য, ক্রমে তাহার মনে দারুণ অধীরতা বাড়িতে লাগিল,—কিন্তু ভবিষ্যৎ! সে উভয় সঙ্কটে পড়িয়াছে, এখন যদি ফিরিতে চায়, তাহাহইলে মহা বিপত্তি; ভবিষ্যৎ উন্নতির মূলে কুঠারাঘাত করা হইবে, অন্যায়ের সংস্রব এড়াইয়া এখন সন্তর্পণে চলিতে হইলে, অনেকেই ঘোরতর অসন্তুষ্ট হইবেন, চাই কি পঞ্চায়েতের কোপে পড়িতেও পারে,—তখন সে কিসের বলে আত্ম-রক্ষা করিবে? সে যে নিজের শক্তি পরের হাতে তুলিয়া দিয়াছে, এখন উপায়?

দুশ্চিন্তালাঞ্ছিত ভাইলাল শুষ্কমুখে দিন কাটাইতে লাগিল। ওদিকে সেদিনের সেই ঘটনায়, কনকের কনকোজ্জ্বল মধুর সৌন্দর্য্য নবীন আবেশে নূতন অপরূপতায়, তাহাকে পলে-পলে তিলে-তিলে আবিষ্ট করিয়া নতুন আকর্ষণে টানিতে লাগিল! হায় সে কি করিবে!

ভর্ত্তাগ লাঞ্ছিত যুবক জানুর ভিতর মাথা রাখিয়া বিমূঢ়ের ন্যায় কেবল ভাবিতে লাগিল, অকূল অসীম চিন্তার মাঝে—কনকের সেই বাণী থাকিয়া থাকিয়া অন্তর্জগত চমকিত করিয়া বজ্র উচ্চস্বরে ধ্বনিত হইতে লাগিল—"ফেরো ফেরো, এখনো ফেরো।"

৪

দেখিতে দেখিতে দুই মাস কাটিয়া গেল, প্রভরাণ কোনোই কূল-কিনারা করিতে পারিল না। কনক আজিও অনূঢ়া।

রাসপূর্ণিমার দিন বৈকালে পাড়ার সব ছেলে-মেয়েদের জড়ো করিয়া, বিঠোবা দর্শন করিতে যাইবার সময়, নরু নানকীর মা কনককেও ডাকিল। কনক গৃহ-কার্য্য সব সারিয়া তখন পিতার জলখাবার সাজাইতেছিল, নানকীর মা, তাহাকে পশ্চাদ্বর্ত্তী হইতে আদেশ করিয়া, ছেলের পাল লইয়া, বহুবিধ শব্দ-বৈচিত্র্যে নির্জ্জন গ্রাম্য-পথ মুখরিত করিয়া দেবদর্শনে চলিল। গ্রাম হইতে সিকি ক্রোশ তফাতে বিঠোবাদেবের মন্দির।

তাড়াতাড়ি হাতের কাজ সারিয়া, মাতার অনুমতি লইয়া, কাপড় চোপড় পরিয়া কনক বাহির হইল। তাহার পুরোগামীগণ তখন অর্দ্ধ পথ অতিক্রম করিয়া গিয়াছে।

পথ ঘাট সবই জানা, কনক সঙ্গীদের সহিত মিলিত হইবার জন্য ছুটিয়া চলিল। হেমন্তের নূতন হাওয়ার মাঝে, লালিত-লাবণ্য-হিল্লোলিত তরুণ তনুলতা, মৃদু-কম্পনশীল বসন্ত-সৌরভের মত বহিয়া চলিল! কঠিন নিস্তব্ধ রাজপথ, সেই শুভ্র কোমল পায়ের তলায় বুক পাতিয়া, মোহমুগ্ধের মত নীরবে পড়িয়া রহিল।

দুপাশে সারি বাঁধিয়া গাছগুলি সাজানো। অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন গ্রামের বাঁধা পথ ছাড়িয়া, কনক ছুটিতে ছুটিতে শেষে উন্মুক্ত আকাশের তলে, সুদূর বিস্তৃত মাঠে অনেকখানি আলোকের নীচে—অনেকখানি ফাঁকা জায়গায় আসিয়া পড়িল।

আঃ কি সুন্দর খোলা জায়গা! এখানকার হাওয়ায় একটা নিশ্বাস টানিয়া লইলেই সারা প্রাণ অপরিসীম তৃপ্তির উল্লাসে ভরিয়া উঠে! আঃ এখানকার চারিদিকেই যেন অনন্ত অসীম মধুর মুক্ত, সান্ত্বনা! কি চমৎকার!

ছুটিতে ছুটিতে ঝোপের পাশটা ছাড়াইয়া; কনক হঠাৎ একটা লোকের সামনে আসিয়া পড়িল, লোকটা বাঁ দিকের ঝোপের আড়ালের ওই রাস্তা ধরিয়াই বরাবর এইদিকে আসিতেছিল বলিয়া কনক তাহাকে দেখিতে পায় নাই।

আরে ছাঃ!—একেবারে চোখোচোখী! ভাইবাবা!

বাঁ করিয়া পথ ছাড়িয়া মাঠে পড়িয়া একেবারে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুট! আর ফিরিয়া চাহিলও না! অদূরেই সঙ্গীরা,—কনক

ছুটিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে তাহাদের কাছে গিয়া পড়িল।

দুঃসহ লজ্জা ও ক্ষোভে তাহার সর্ব্ব শরীরে তখন অসহ্য জ্বালাময় অগ্নিস্রোত বহিতেছিল! ছি ছি, ভাইলালের সঙ্গে আবার চোখোচোখী হইল! সে যে ইহার জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না! অতর্কিতে সংঘটিত ক্ষণিকের এই সামান্য বিড়ম্বনাটুকু কত ভয়ানক, কি সাংঘাতিক! একটা তীক্ষ্ণ ধিক্কারে ও মর্ম্মান্তিক বেদনায় কনকের সারা বুকটা যেন খোঁচাইয়া খোঁচাইয়া ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিল! কনক মুখ তুলিয়া কাহারো সহিত কথা কহিতে পারিল না; নীরবে নতশিরে চলিল।

যথাসময়ে বিঠোবার মন্দিরে আসিয়া সকলে বিগ্রহকে প্রণাম করিল। তখনো সন্ধ্যা আরতির দেরী আছে দেখিয়া, নানকীর মা ছেলেদের লইয়া মন্দির-প্রাঙ্গণে বসিল। সেখানে একজন সাধু 'অভাঙ্গ' গাহিতেছিলেন, অনেক লোক বসিয়া শুনিতেছিল; তাহারাও শুনিতে লাগিল।

উগ্র-বৈরাগ্য-উদ্দীপ্ত, তীব্র-ভক্তি-মাদক পূর্ণ, মধুর হইতে মধুরতম ভজন, সংসার-বিতৃষ্ণ ভক্তের প্রেমবিগলিত স্বরে অন্তরের গভীর আবেগ উচ্ছ্বাস! দেবতার পদে উন্মুক্ত আত্মনিবেদন! কি সুন্দর।—শুনিতে শুনিতে কনকের তরুণ বক্ষের মধ্যে বিরাগ-ব্যাকুলতার প্রচণ্ড বন্য ঝঞ্ঝনা বাজিয়া উঠিল! ধীরে ধীরে কুহেলিকা-ঘোর কাটিয়া সারা জগৎ আলোর পুলকে মুগ্ধ অভিভূত করিয়া আনন্দ-চন্দ্র হাসিয়া উঠিল। সে কি গভীর বিস্ময়! কি নিবিড় সান্ত্বনা! —মানুষ মানুষকে শঠতায় সর্ব্বস্বান্ত করিবে! প্রতারণায় পরাভূত করিবে! কি ভুল, কি ভুল!—মানুষ নিজের সহিত নিজে যে শত্রুতা সাধিয়া রাখিয়াছে, তাহার উপর—পরে আসিয়া অনিষ্ট করিবার স্থান নাই, মানুষ বোঝে না, তাই হীনতার চরণে মাথা খুঁড়িয়া মরে, ধিক্!

বিক্ষোভ-উত্তপ্ত জীবনে আজ ধীরে, অতি শান্তভাবে অপার্থিব শান্তির বসন্ত আসিল! নীরস হৃদয়-ক্ষেত্র মঙ্গল-সুধা বর্ষিত হইল! আশায়, উজ্জ্বল-উৎসাহে তাহার সমস্ত চিত্ত মহাভাবে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল!

কে বলে মানুষের জীবন ব্যর্থ! কে বলে মানুষের আর উপায় নাই! ঐত সম্মুখে উপায়। ঐযে সর্ব্বার্থসাধক সর্ব্ব-মঙ্গলময় দেবতা, অমর সার্থকতার আশীর্ব্বাদ লইয়া আবির্ভূত। তবে কাকে ভয়, কিসের সঙ্কোচ, কার মুখাপেক্ষা!—সে আত্মত্যাগের মাঝে আপনাকে জয় করিয়া লইবে, নিষ্কাম সাধনায় আপনাকে পূর্ণ করিয়া লইবে। হে ভগবান শক্তি দাও।

আগামী বারে সমাপ্য।

শ্রীশৈলবালা ঘোষ জায়া।

বিবিধ সংবাদ।

১। সম্প্রতি ইটালীদেশে শিক্ষয়িত্রী "মন্টীশ্বরী" বালক বালিকাদিগের জন্ম এক নূতন শিক্ষা-পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি বলেন, শিশুদিগকে কোনো রূপ দণ্ড না দিয়া কল্পনা বা খেলনার সাহায্য ব্যতীত শিক্ষা দেওয়াই যথার্থ শিক্ষা। এই রমণী রীতিমত চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া শিক্ষাকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। মানসিক বিকৃতিতে তাঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা থাকায় শিক্ষা সম্বন্ধে কি কি প্রণালী অবলম্বন করিলে অপরিণত বয়স্কগণের ভবিষ্যৎ জীবন সুন্দরভাবে গঠিত হইতে পারে তদ্‌বিষয়ে নানারূপ উপায় উদ্ভাবন করিয়া শিক্ষাকার্য্যে হস্তক্ষেপ ও আশানুরূপ ফল লাভ করিতেছেন।

২। এইরূপ শুনা যাইতেছে যে, লর্ড হার্ডিঞ্জ মহোদয়ের স্থানে ভারতের ভাবী বড় লাট হইবেন লর্ড চেমস্‌ফোর্ড সাহেব।

৩। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় হইতে শ্রীযুক্ত দাদাভাই নওরোজী মহোদয়কে ডি-এল, উপাধি প্রদান করা হইয়াছে।

৪। কাচ কিম্বা চীনা বাসন ভাঙিলে অনেকে তাহা অব্যবহার্য্য মনে করিয়া ফেলিয়া দেন। ফটকিরি আগুনে গলাইয়া তদ্দ্বারা ভগ্নাংশ জুড়িয়া দিলে তাহা বেশ লাগিয়া যায়।

৫। রাণীর বাঘ শিকার—সৌড়ূর নামক ক্ষুদ্র রাজ্যের শ্রীমতী সৌভাগ্যবতী "তারারাজে" রাণীসাহেবা খোরপড়ে একটি বাঘ শিকার করিয়াছেন। কিছু দিন হইতে তাঁহার শিকারের সখ চড়ে। গত বৎসর ৯ই আগষ্ট সন্ধ্যা ৭॥ টার সময় সৌড়ূর রাজ্যের স্বামীকার্ত্তিক পাহাড়ের পশ্চাতে তিনি এই বাঘ শিকার করেন। শিকারের সময় তাঁহার কাছে আর কোনো মানুষ ছিল না; তিনি তখন শিকারের বেশেও ছিলেন না। কিন্তু বাঘকে সামনে আসিতে দেখিয়া অব্যর্থ সন্ধানে এক গুলিতেই তাহার প্রাণবধ করেন। রাণী সাহেবা অক্কলকোটের মহারাজার তৃতীয় কন্যা। তাঁহার বয়স ন্যূনাধিক বিশ বৎসর। "হিন্দি চিত্রময় জগতে" এই সংবাদ ও রাণীর ছবি বাহির হইয়াছে।

"প্রবাসী।"

বামারচনা।

বরণ-অর্ঘ্য*

নমি পূজনীয়া [illegible] পুণ্যোজ্জ্বলা
    "বিজয়-কেতন" দ্যুতি ;—
[illegible] অঙ্কিত তেজে,
    শান্ত সৌম্য জ্যোতি।
কত সুন্দর আশা বাসনায়,
    "উদয়-জননী" তুমি!
নবীন আলোকে, নব গরিমায়,
    উজলি বঙ্গভূমি!
উজল শীর্ষ, "বিদ্যা-আলয়"
    আজি গৌরব রাগে,
মাতৃ-আশীষে, হর্ষ-আবেশে,
    প্রণমি চরণ যুগে।
দীনে দৃষ্টি যার, সেই তো মহান্,
    সেইত' দেবতা বিশ্বে—
নমো মহাদেবী নমস্তে জননী
    বন্দি প্রণতশীর্ষে।
রাণী-মহারাণী!—তুমি মা মোদের
    স্বতঃ উচ্ছ্বাসিত প্রাণে—
শ্রদ্ধারচিত, যত্ন পূজিত,
    হৃদয়-সিংহাসনে!
প্রাণ-কম্পনে প্রীতির প্রবাহে,
    মাতৃ মূরতি রাগে—
জননী মোদের জয়দা মোদের,
    প্রণমি চরণ যুগে।
রমণী-রূপেতে, রমণীয় ব্রতে,
    বাড়ায়েছ দুটি হাত—
মমতা ও স্নেহে উদার প্রবাহে,
    ভাঙি সঙ্কোচ-বাঁধ।
দৃঢ় উদ্যমে শিখি অবলার,
    মহান্ কর্ম্ম-স্রোতে—
গৃহে গৃহে গৃহে, গৃহিণী গড় মা,
    শ্রেষ্ঠ শিক্ষাব্রতে।
"ভবিষ্য মাতারে"—কর মা "মানুষ"—
    দৃপ্ত গরিমা-রাগে—
জননী মোদের, জয়দা মোদের,
    প্রণমি চরণ যুগে!
জাগাও বুদ্ধি, ঋদ্ধি সাধনে,
    শিখাও স্বার্থ-জয়—
বুঝাও রমণী "বিশ্ব জননী"—
    বিলাস-ভামিনী নয়।
নীচতায় তার, নাহি অধিকার,
    উন্নত তার ধর্ম্ম ;
কল্যাণ-পথে, শুভ সাধনাতে
    রমণী বিশ্বে রম্য।
ফুটাও মাধুরী কলিকা-জীবনে
    স্বর্গ-সুষমা-রাগে ;
জননী মোদের, জয়দা মোদের,
    প্রণমি চরণ যুগে।
নারী নহে দীন, নারী নহে হীন,
    নারী মানবের ধাত্রী,
নারীর বক্ষে ধর্ম্ম শর্ম্ম
    লভে অনন্ত যাত্রী!

* বর্দ্ধমান মহারাণী রাধারাণী বালিকা-বিদ্যালয়ের বার্ষিক পারিতোষিক বিতরণ-উৎসবে শ্রীশ্রীবুক্তেশ্বরী মহারাণী দেবীর প্রতি উৎসর্গ।

প্রাণে প্রাণে প্রাণে, প্রীতি-বন্ধনে,
মাতৃর সুপ্ত শক্তি,
স্নেহ মমতায় ক্ষমা করুণায়
উদ্বোধে জ্ঞান-ভক্তি।
সুপ্ত জননী, ডাকি নিখিলে,
জগৎ অনুরাগে,
জননী মোদের, জননী মোদের,
প্রণমি চরণ যুগে।
জাতির জননী আনন্দরূপিণী
পুণ্য-প্রেমের ছবি,
"মানুষের মাতা" হয় যেন এরা,
তোমারি করুণা লভি।

জেগেছে রমণী—কল্যাণরূপিণ,
যোগেছে সাধনা বল,
আত্মার পাশে হোক্ আত্মা—
অঙ্গকে সমুজ্জ্বল...
জাগাও জননী—জীবনে "জী...
চেতনা শুদ্ধি ...
জননী মোদের, জননী মোদের,
প্রণমি চরণ যুগে!

শ্রীশৈলবালা ঘোষ জায়া।
(বিদ্যালয়ের জনৈকা ভূতপূর্ব্বা ছাত্রী)

কে তুমি?

(কে তুমি) সুন্দর, মধুর কোমল, নির্ম্মল,
সুপবিত্র নিষ্কলঙ্ক।
অপাপ, অনিন্দ্য, অম্লান, অতুল,
অম্লান নিরাতঙ্ক।
অদেয়, অমূল্য, উজ্জ্বল, আলোক,
সুতর্পিত, সুবাঞ্ছিত।
সংসারের সার, মানবজীবনে,
বিধাতৃ কর-প্রেরিত।
সরল সহাস, ... সুশান্ত,
সুধাময় সুললিত।

নিখিলে মিলেনা, এ হেন রতন,
স্বর্গ-দেবতা-পূজিত।
শুভ আশীর্ব্বাদ এ দীন ভবনে,
পুলকে আলোকে মণ্ডিত।
শুধাই তোমারে "কে তুমি কে তুমি"
চিত্ত কর বিমোহিত।
অখিল বিশ্ব ডাকিছে তোমারে,
"শিশু" নামে পরিচিত।
তুমি কল্যাণ, তুমি মঙ্গল,
হৃদ্ হেথা বিরাজিত।

শ্রীমনোরমা বারচৌধুরী।

---

৩৭ নং মথুরবাবু লেন, হিতবাদী প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৩৮ নং আশ্‌টিনবাগান হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 630. February 1916.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৩ বর্ষ। ৬৩০ সংখ্যা। { মাঘ, ১৩২২। ফেব্রুয়ারি, ১৯১৬। } ১০ম কল্প। ৪র্থ ভাগ।

১

আজ আলোকের এই ঝরণা ধারায়
ধুইয়ে দাও,
আপনাকে এই লুকিয়ে রাখা ধূলার ঢাকা
ধুইয়ে দাও।
যেজন আমার মাঝে জড়িয়ে আছে
ঘুমের জালে
আজ এই সকালে ধীরে ধীরে তার কপালে
এই অরুণ আলোর সোনার কাঠি
ছুঁইয়ে দাও।
বিশ্ব-হৃদয় হতে ধাওয়া
আলোয় পাগল প্রভাত হাওয়া
সেই হাওয়াতে হৃদয় আমার নুইয়ে দাও।
আজ নিখিলের আনন্দ ধারায় ধুইয়ে দাও
মনের কোণের সব দীনতা মলিনতা
ধুইয়ে দাও।
আমার পরাণ বীণায় ঘুমিয়ে আছে
অমৃত গান
তার নাইক বাণী নাইক ছন্দ নাইক তান,
তারে আনন্দের এই জাগরণী
ছুঁইয়ে দাও।
বিশ্ব-হৃদয় হতে ধাওয়া
প্রাণে পাগল গানের হাওয়া
সেই হাওয়াতে হৃদয় আমার নুইয়ে দাও।

২

এই ত তোমার আলোক-ধেনু
সূর্য্যতারা দলে দলে;
কোথায় বসে বাজাও বেণু
চরাও মহা গগনতলে।
তৃণের সারি তুলছে মাথা
তরুর শাখে শ্যামল পাতা,

আলোয়-চরা ধেনু এরা
ভিড় করেছে ফুলে ফলে।
সকাল বেলা ঘুরে ঘুরে
উড়িয়ে ধূলি কোথায় ছোটে।
আঁধার হলে সাঁঝের সুরে
ফিরিয়ে আন আপন গোঠে।
আশা তৃষা আমার যত
ঘুরে বেড়ায় কোথায় কত,
মোর জীবনের রাখাল ওগো
ডাক দেবে কি সন্ধ্যা হলে?

৩

অন্ধকারের উৎস হতে
উৎসারিত আলো
সেই তো তোমার আলো।
সকল দ্বন্দ্ব বিরোধ মাঝে
জাগ্রত যে ভালো
সেই তো তোমার ভালো।
পথের ধুলায় বক্ষ পেতে
রয়েছে যেই গেহ
সেই তো তোমার গেহ।
সমর-ঘাতে অমর করে
রুদ্র নিঠুর স্নেহ
সেই তো তোমার স্নেহ।
সব ফুরালে বাকি রহে
অদৃশ্য যেই দান
সেই তো তোমার দান।
মৃত্যু আপন পাত্রে ভরি
বহিছে যেই প্রাণ
সেই তো তোমার প্রাণ।
বিশ্বজনের পায়ের তলে
ধূলিময় যে ভূমি
সেই তো স্বর্গভূমি।
সবায় নিয়ে সবার মাঝে
লুকিয়ে আছ তুমি
সেই তো আমার তুমি।

৪

মেঘ বলেছে যাব যাব;
রাত বলেছে যাই;
সাগর বলে, কূল মিলেছে
আমি তো আর নাই।
দুঃখ বলে রইনু চুপে
তাঁহার পায়ের চিহ্নরূপে;
আমি বলে, মিলাই আমি
আর কিছু না চাই।
ভুবন বলে তোমার তরে
আছে বরণ-মালা।
গগন বলে, তোমার তরে
লক্ষ প্রদীপ জ্বালা।
প্রেম বলে যে, যুগে যুগে
তোমার লাগি আছি জেগে;
মরণ বলে, আমি তোমার
জীবন-তরী বাই।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কিরাতার্জ্জুনীয়।

(মহাকবি ভারবি-বিরচিত কিরাতার্জ্জুনীয় মহাকাব্যাবলম্বনে)

প্রথম সর্গ।

সুনিবিড় শ্যামশোভা দ্বৈতবনে যুধিষ্ঠির
করেন বসতি ;
আসিল সকাশে তাঁর ব্রহ্মচারি-বেশে দূত
কিরাত সুমতি ;
পাণ্ডব-আদেশে যিনি বিচরি হস্তিনাপুরে
কুরুরাজধানী,
বিদিত কৌরবপতি কোন্ নীতি অনুসরি
পালিছে অবনী।

সম্ভ্রমে প্রণাম করি বসিয়া বিহিতাসনে,
বর্ণনে বাসনা,
কি ভাবে দুর্দ্দমশ্রেষ্ঠ রক্ষিতে বিজিত মহী
করিছে সাধনা ;
যদ্যপি অপ্রিয় বাণী, তথাপি হৃদয় তার
নহেক কাতর,
তোষে না হিতৈষী কভু অনৃতমধুরভাষে
প্রভুর অন্তর।

একান্তে আসীন দোঁহে; শক্রজয়-অভিলাষী
অধিপ-আজ্ঞায়,
বিজ্ঞাপিল বনেচর বিশেষ সৌষ্ঠবশালী
গম্ভীর ভাষায় ;
বহুক্লেশে ছদ্মবেশে ভ্রমি দেশ দেশান্তরে
নিশ্চিত প্রমাণ,
যে সমূহ তথ্যরাজি, নিবেদি সকল প্রভো,
কর অবধান।

গুপ্তচর-চক্ষু-বলে করেন নৃপতিগণ
সতত দর্শন
নিয়োজিত প্রণিধির সমুচিত নহে কভু
বঞ্চনা, রাজন্ ;
ক্ষমা কোরো সেই হেতু সাধু বা অসাধু যদি
সন্দেশ আমার ;
দুর্লভ ধরণীতলে মনোজ্ঞ কল্যাণকর
বচন-সম্ভার।

হিত উপদেশ যেথা না দেয় প্রভুরে কভু
দুর্ম্মন্ত্রী সেজন,
দুষ্ট প্রভু নাহি শোনে অমাত্যের হিতকর
অপ্রিয় ভাষণ ;
অমাত্য-অধিপ যেথা গ্রথিত প্রীতির সূত্রে,
অন্যোন্য সহায়,
অকপট অনুরাগে অচলা চপলা সদা
বিরাজে তথায়।

নিসর্গ দুর্ব্বোধ কোথা কূটনীতি-পরায়ণ
নৃপতি-আচার ;
বিচার শকতিহীন অবোধ বিকৃতমতি
কোথা বা আমার ;
তথাপি নিগূঢ়তত্ত্ব অরাতির রাজতন্ত্র
বিদিত যে আমি
সম্ভাবিত শক্তি তাহা অপূর্ব্ব প্রভাবে তব*
হে জীবনস্বামি,

সম্রাটের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত দুর্য্যোধন,
তথাপি তাঁহার
বনবাসী পাণ্ডবের প্রতাপে শঙ্কিত হৃদি,
সদা গুরুভার ;
সুবিশাল রাজ্য তব হেলায় অর্জ্জন করি
ভুরোদরচ্ছলে,
শাসিতে সচেষ্ট আজি সমগ্র ধরণীতল
স্বতঃ নীতিবলে।

সদ্গুণ সম্পদে তব সুনির্ম্মল যশোভাতি
আবরণ-আশে
আজন্ম কুটিলমতি, তথাপি ভাস্বরজ্যোতি
মহিমা প্রকাশে ;
অনার্য্য-সজনে যত হৃদয়ের উচ্চভাব
পায় যে বিলয়,
উদার চরিত্রগণে বিরোধেও মানবের
মহত্ত্ব-উদয়।

অদম্য উৎসাহ-বলে বিদলি অন্তর-রিপু
মহাদুর্নিবার,
দিবানিশি অতন্দ্রিত সুনীতিসহায়ে করে
পৌরুষ বিস্তার ;
মনুর পদাঙ্ক-লেখা অনুসরি মহোল্লাসে
অতীব দুর্লভ
সিদ্ধিলাভ-বাসনায় পালিছে প্রকৃতিপুঞ্জ
বর্দ্ধিতগৌরব।

অনুজীবিগণে সদা প্রীতিমান্ মিত্র-সম
স্নেহ ব্যবহার ;
হিতৈষী সুহৃদগণে আত্মীয় কুটুম্ব-সম
মধুর সৎকার ;
স্বজন সকাশে পুনঃ বিনয়-বিনম্রভাব
যেন বা অধীন ;
নাহি সে পূর্ব্বের গর্ব্ব, এবে রাজা অহঙ্কার-
লেশ মাত্রহীন।

ধর্ম্ম-অর্থ-কামরূপ ত্রিবর্গ সাধনে রত
অসক্ত অন্তর ;
নাহি কোনো পক্ষপাত; যথোচিত ভক্তি-
ভরে সেবে নিরন্তর ;
গুণ-অনুরাগে যেন মিত্রভাবে অবস্থিত
হৃদয়ে তাহার,
পরস্পরে নাহি বাধা, সমান প্রভুত্ব সবে
করিছে বিস্তার।

নহে দানবিরহিত সম্রাটের অমায়িক
প্রিয় সম্ভাষণ ;
সমাদর-বিবর্জ্জিত নহে কভু প্রভূত সে
ধন-বিতরণ ;
সদ্গুণ সম্পদ বিনা প্রাবি তাঁর হৃদিতট
বহে না উজ্জ্বল
সুবিমল প্রীতিধারা, স্নিগ্ধ করি সুজনের
অন্তর বিহ্বল।

মহীপাল ধর্ম্ম সহ দুষ্ট-নিপীড়ন আর
শিষ্টের পালন,
ক্রোধে কিম্বা ধনলোভে বিনা দোষে কভু
কারো না হয় শাসন ;
প্রধান বিচারপতি-উপদিষ্ট দণ্ডদানে
সতত তৎপর,
অধর্ম্ম দমনে তাঁর অমাত্যিকনয়ে নাহি
ভেদ আত্মপর।

নিয়োজিত নিরন্তর বিশ্বাসী রক্ষক কত
স্বপর মণ্ডলে,
শঙ্কিত হৃদয়ে তাঁর সুশীতল শান্তিসুধা
ঢালে সুকৌশলে;
কর্ম্মশেষে নরপতি বিপুল বিভবরাশি
দেন পুরস্কার,
কৃতজ্ঞতা কভু নাহি প্রকাশে কেবল মাত্র
প্রিয়বাক্য তাঁর।

সুবুদ্ধি-সহায়ে সদা সুবিহিত শক্রমাঝে
উপায় সকল,
সুবিশাল রাজ্যে তাঁর নাহিক কৌরব-
বেষী বিদ্রোহী প্রবল;
সাম, দান, ভেদ, যুদ্ধ কুফল প্রসব কভু
করে না তাঁহার,
সঙ্ঘর্ষ প্রভাবে যেন বর্দ্ধিত করিছে নিত্য
কল্যাণ-সম্ভার।

প্রভিন্ন বারণ কত উপহার দেয় তাঁরে
নৃপতিমণ্ডল,
সপ্তপর্ণদল-সম বিতরি মধুর গন্ধ
ক্ষরে মদজল;
রাজন্যনিকর-রথ-তুরঙ্গ-সঙ্কুল সভা-
মন্দির-প্রাঙ্গণ,
পরিষিক্ত গজমদে সতত সুবাসে তোষে
পারিষদগণ।

প্রজার মঙ্গলতরে হিতকর অনুষ্ঠানে
মুক্ত কোষাগার,
কৃষীবল জনপদে চাহে না সলিলধারা
ঘন বরষার;
উপজে বিবিধ শস্য অনায়াসে ক্ষেত্রে যেন
বিনা করষণে;
শ্যামল বসনে যেন বিরাজিতা কুরুলক্ষ্মী
সস্মিত-আননে।

সদয়, উদারকীর্ত্তি, নিয়ত নিপুণ হস্তে
প্রকৃতি-পালন;
শান্ত যত উপদ্রব, পদে পদে চতুর্দ্দিকে
গৌরব-লক্ষণ;
ধনপতিতুল্য তাঁর সদ্‌গুণ-প্রভাবে যেন
তরল-হৃদয়
মেদিনী দোহন করে, আপনি সন্তোষ
হেতু রতন নিচয়।

সমরে প্রথিতনামা অমিতবিক্রম কত
মহাধনুর্দ্ধর
সুজাত, সম্মানধন, পুরস্কৃত, রাজকার্য্যে
সমুদ্যত-কর;
পরস্পরে নাহি কভু সংহতি বিরোধ কোন
অশিবনিদান,
সতত বাঞ্ছিতলাভে সচেষ্ট সকলে রক্ষি
নৃপতির প্রাণ।

অভীষ্ট সাধনে কভু বিরাম নাহিক তাঁর
বিনা ফলোদয়,
সুজন প্রণিধিমুখে বিদিত নৃপতিবৃন্দ
ক্রিয়া সমুচ্চয়;
বিধাতার কার্য্য যথা গম্ভীর অবোধগম্য
প্রারম্ভ তাঁহার;
মহোদয় শুভঙ্কর সিদ্ধিলাভ বিনা নহে
উদ্দেশ্য-প্রচার।

সমুত্থিত নহে কভু কার্ম্মুক শিঞ্জিনীযুত
অরাতি-সন্ধান,
চিরহাস্যময় সেই বদনে হয় না কভু
ক্রোধের প্রকাশ ;
সুরভি-সুন্দর পুষ্পে গ্রথিত মালিকা যথা
বহু গুণময়,
বহে তার সুশাসন আনন্দে আপন শিরে
নরপতিচয়।

নিয়োজিত দুঃশাসন যুবরাজপদে, দৃপ্ত
নবীন যৌবন ;
পুরোধার অনুমতি শিরোদেশে ধরি রাজা
অলঙ্ঘ্য-শাসন,
বিশাল মণ্ডপ-মাঝে মহাযাগ-অনুষ্ঠানে
করেন বসতি
মাঙ্গলিক আজ্যদানে হিরণ্যরেতসে তোষে
সমাহিতমতি।

আসমুদ্র ভূমণ্ডলে যদ্যপি প্রলীন যত
সপত্ন ভূপাল,
যদ্যপি গভীর শান্তি অকুণ্ঠ প্রতাপ-বলে
রাজে চিরকাল ;
তথাপি পাণ্ডবভীতি-জলদে আবৃত তাঁর
হৃদয়-গগন ;
বিরোধ প্রবলসনে সতত অশান্তিময়,
অহো কি ভীষণ !

কথায় প্রসঙ্গে যদি কেহ কভু তব নাম
করে উচ্চারণ,
অর্জ্জুনের তেজোরাশি স্মরিয়া দুঃসহ দুঃখে
আনত-আনন ;

ফণাধর সর্প যথা বিষবৈদ্য-উচ্চারিত
শুনি মন্ত্রধ্বনি,
তক্ষক বাসুকি নাগে প্রাকৃত বিক্রম স্মরি
আনত আপনি।

সমুদ্যত নরপতি করিতে কপট বলে
পাণ্ডব-বিলয়,
সমুচিত প্রতিকার বিধানে সত্বর দেব,
কর শত্রুজয় ;
ভ্রমি দূর দূরান্তরে অন্য সহ আলাপনে
আনি সমাচার,
মন্ত্রণা-অপটু মন্দ আমাদের বাক্যাবলী
কথামাত্র সার।

সুধীরে কিরাতপতি নিবেদি সন্দেশ হেন
গম্ভীর বচনে,
সাদর সৎকার লভি চলিলা ত্বরিতপদে
কানন-ভবনে ;
ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির দ্রৌপদী-সদনে গেলা
স্থির অচঞ্চল,
বলিলা অনুজগণে বনেচর-বিজ্ঞাপিত
বারতা সকল।

শুনিয়া অরাতিশ্রেষ্ঠ কৌরবপতির সেই
বিপুল গৌরব,
অপমান-নিপীড়িত দ্রুপদতনয়া-হৃদে
বিকার-উদ্ভব ;
আলোড়িত মনোভাব নিরুদ্ধ করিতে
নারি সতীশিরোমণি,
সগর্ব্বে কহিলা বালা সঞ্চারিতে
রোষানল উদ্দীপনা বাণী।

সুবুদ্ধি পণ্ডিত তুমি রাজনীতিবিশারদ
আরাধ্য আমার,
তবাদৃশ জনে দেব, প্রমদা-নিয়োগ-বাণী
যেন তিরস্কার ;
তথাপি এ দীর্ঘকাল অসহ যন্ত্রণা আর
সহিতে না পারি
প্রকাশি হৃদয়ভাব অবলার সমুচিত
লজ্জা পরিহরি।

দুর্ব্বার সুরেন্দ্র-সম বিখ্যাত ভরতকুলে
নৃপতি সকল
প্রচণ্ড প্রতাপে সদা শাসিত অখণ্ড এই
অবনী-মণ্ডল ;
তুমি কিন্তু মহারাজ কুসুম-মালিকা যথা
প্রমত্ত বারণ
আপনার করে তুলি সুখভোগ্যা বসুন্ধরা
দিলে বিসর্জ্জন।

কপট-আচারি-সনে সেই জন নাহি করে
কপট আচার,
বিমূঢ় বিবেক বুদ্ধি, সুনিশ্চিত পরাভব,
কলঙ্ক তাহার ;
বর্ম্মহীন বীরদেহে সহজে প্রবেশে যথা
নিশিত সায়ক,
সরল ধার্ম্মিকমতি সুজনে আত্মীয় ছলে
বধে প্রবঞ্চক।

কোন্ রাজা তোমা বিনা উদগ্র ক্ষত্রিয়
বীর্য্য প্রবল সাধন,
ছদ্মবেশী বৈরি-করে অনুকূল কুললক্ষ্মী
করে সমর্পণ ?

শুনেছ কি কভু দেব কখনো কোথাও
কোনো কুলীন-সন্তান
সুন্দরীর শিরোমণি প্রণয়িনী কুলবধূ
অন্যে দেয় দান ?

নহে কভু সমুচিত মনস্বী বীরের কার্য্য
কপটে প্রশ্রয়,
সম্মুখ সমর ত্যজি প্রণত মস্তকে বহে
দৈন্য পরাজয় ;
কেমনে জ্বলে না বল উদ্দীপিত রোষানলে
হৃদয় তোমার ?
সমুজ্জ্বল বহ্নিশিখা পরিশুষ্ক শমীতরু
করে পরিহার ?

অবন্ধ্য যাহার ক্রোধ পরাঙ্মুখ নহে কভু
বৈরনির্য্যাতনে,
সুলভ গৌরব তার, প্রকম্পিত শত্রুগণ
লুটায় চরণে ;
পদে পদে অবজ্ঞাত কাতর ঐশ্বর্য্যহীন
ক্রোধশূন্য জন,
কিলাভ সৌহার্দ্দ্যে তার ? বিদ্বেষে নাহিক
কোন ভীতির কারণ।

চেয়ে দেখ মহারাজ,এই কি সে ভ্রাতা তব
বীর বৃকোদর,
আরক্ত-চন্দন-ভাগে ভ্রমিত যে মহারথ
উল্লাস-অন্তর,
ভ্রমে আজি পদব্রজে ধূলিম্লান দেহকান্তি
পর্ব্বত কাননে,
তথাপি কি সত্যধন, আলস্যে কাটাবে
কাল চিন্তা নাহি মনে ?

অই দেখ ধনঞ্জয়, একাকী উত্তরকুরু
করিয়া বিজয়
অধিবাসিগণে দিলা প্রভূত সুবর্ণরৌপ্য
রতন-নিচয়,
সেই সে বাসবোপম পরি আজ বল্কবাস
ভ্রমে বনে বনে।
তথাপি কি সত্যধন, আলস্যে কাটাবে
কাল চিন্তা নাহি মনে?

অই দেখ মাদ্রীদেবী-যমজ তনয়যুগ
কুসুম-কোমল,
বনান্তশয্যায় আজি কঠিন-আকৃতি-গ্রস্ত
বিশীর্ণ কুন্তল,
গিরিপঙ্ক-তুল্য দেহ, বিশুষ্ক লাবণ্যলীলা
মধুর আননে।
তথাপি কি সত্যধন, সন্তোষে কাটাবে
কাল, সুসংযত মনে?

বুঝিতে পারি না দেব, কিরূপ হৃদয়ভাব
সম্প্রতি তোমার।
জগৎ বৈষম্যময়, মানবের চিত্তবৃত্তি
বিচিত্র-প্রকার;
অনভ্যাসে বনবাসে দারুণ দুর্দ্দশা তব
হেরি নিরন্তর,
অহো কি বেদনাভরে সতত অন্তর মম
বিকল কাতর।

কোথা আজি মহারাজ, সুন্দর কোমল তব
অমূল্য শয়ন?
কোথায় বা সুনিপুণ বৈতালিক স্তুতি-
গীতি মঙ্গল-বোধন?

দুঃসহ-কঠিনস্পর্শ বহুকুশ বনস্থলী
শয্যা সে তোমার
বিনিদ্র সতত শুনি অশিব বিকটশ্রুতি
শিবার চিৎকার।

তুষিতে যে প্রতিদিন সুখাদ্য-আহার-দানে
সহস্র ব্রাহ্মণ,
রমণীর কলেবর সর্ব্বশেষে পরিতোষে
করিয়া ভোজন,
অন্নের অভাব আজি অধিমিশ্র বন্যফল
ভক্ষ্য সে তোমার
পরিক্ষীণ দেহ, কান্তি; পরিপূর্ণ আজি
তব যশের ভাণ্ডার।

মণিময় পীঠতলে অবিরত সুখশায়ী
যে পদ-যুগল,
রঞ্জিত সতত যাহা শিরোমালা রজোরাগে
রাজেন্দ্রমণ্ডল,
কত না বেদনা পাও সেই সে চরণে
আজি বিচরি কাননে;
ভ্রমে যেথা বহুক্লেশে কুশাগ্রচ্ছেদনরত
মৃগ দ্বিজগণে।

আজি যে দুর্দ্দশা তব একমাত্র দুর্যোধন
কারণ তাহার;
তাই দেব অপমানে সমূলে উন্মূল যেন
মানস আমার;
অরাতির পরাক্রমে অকুণ্ঠিত বলবীর্য্য
অভিমানি জনে
বিপত্তি, উৎসব-সম, আহ্লাদিত করে
নব-উন্মাদনা-দানে।

কে না জানে এজগতে অগ্রনেতা তুমি দেব,
তেজস্বি-সমাজে,
প্রতাপ-দুন্দুভি তব গম্ভীর-আরাবে সদা
চতুর্দ্দিকে বাজে ;
তুমি যদি যশোধন প্রণতমস্তকে সহ
হেন অপমান,
কে আর করিবে বল, গৌরবে ধরণীতলে
আশ্রয় প্রদান।

কি ফল বিক্রমে, যদি জমিতে কপটশক্র
করেছ মনন ?
খুলে ফেল চিরতরে তূণীর কার্ম্মুক অসি
নৃপতি-লক্ষণ ;
জটাজূট শিরে ধরি নিঃস্পৃহ-অন্তরে থাক
তপস্বীর বেশে,
প্রজ্বলিত হোমানলে কর সুখে আত্মদান
মোক্ষলাভ-আশে।

কি ভাবিছ অরিন্দম, নাহি কোনো দোষ হেন
প্রতিজ্ঞালঙ্ঘনে,
কে কবে বিরক্ত বল, কপটী বৈরীর সহ
শাঠ্য-আচরণে!
দুর্ব্বিসহ বীর্য্যবলে সতত বিজয়লক্ষ্মী
অঙ্কশায়ী যার,
সে কি কভু করে দেব, মায়াসন্ধিবিঘটনে
সত্যের বিচার ?

দুর্দ্দৈব রজনীশেষে প্রভাত-সূর্য্যের সম
বর্দ্ধিত শোভায়,
উঠ পুনঃ দীপ্ততেজে বিনাশি ঘনান্ধতম-
অরাতিনিকায় ;
বিপদ-বারিধি-মগ্ন অলুক মহিমা মাখি'
গৌরবকিরণে,
লক্ষ্মীর প্রসন্ন হাসি বিম্বিত হউক তব
প্রফুল্ল বদনে।

ইতি কিরাতার্জ্জুনীয়ে মহাকাব্যে প্রথমঃ সর্গঃ সমাপ্তঃ।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাস।

আদেশ পালন।

(গল্প)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

কনকের শিরায় শিরায় মত্ত আবেগের প্রখর তড়িৎ-প্রবাহ ছুটিয়া ছুটিয়া ফুলিয়া ফাঁপিয়া আকুল উন্মাদনায় ঝঙ্কৃত হইতে লাগিল। কনক নির্জ্জীব পুতুলের মত স্থির!

অনেকক্ষণ পরে কাঁসর ঘন্টার ঘন

ঘোর রোলে ঠাকুরের সন্ধ্যারতি আরম্ভ হইল। সকলে গলবস্ত্র হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

আবেশবিহ্বল কনক মুদিতচক্ষে আপনার অন্তরের দিকে তাকাইল। দেখিল সেখানেও প্রেমের জ্যোতি-মণ্ডিত ভগবান চিত্তোধার উজ্জ্বল চিন্ময় মূর্ত্তি! সে কি চমৎকার! সদা উচ্ছ্বসিত আনন্দ-আবেগে অধীর কনক বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া, একাগ্র নিষ্ঠায় আপনাকে সংযত করিয়া সেই অন্তরদেবতাকে অর্চ্চনা করিতে আরম্ভ করিল।

বাহিরের কোলাহলমুখর জগৎ দূর দূরান্তের অন্ধকার-মধ্যে সসঙ্কোচে পিছু হটিয়া গেল! এ বিচ্ছিন্নতার মাঝে কি নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ! এখন মানুষের সহিত চোখোচোখী হইবার ভয় তাহার নাই! এখন তাহাকে বিচলিত করিবার কেহ নাই,—এখন সে তাহার দেবতার জন্য ছুটি পাইয়াছে, এখন সে নির্ভয়!

আরতি শেষ হইল। সকলে দেবোদ্দেশে মস্তক নত করিল। আত্মহারা কনকের মস্তক আকুল আবেগে একেবারে ঠিক যেন ইষ্টদেবতার পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িল!

আবার ভজন আরম্ভ হইল, সকলে শুনিতে বসিল। রাত্রি হইয়াছে দেখিয়া নানকীর মা ছেলেদের লইয়া মন্দির প্রদক্ষিণ করিতে গেল, কনককেও ডাকিল, কনক শুনিল না, উঠিল না—বুঝি সে-শক্তি তখন তাহার ছিল না। তখন তাহার মন পৃথিবী ছাড়িয়া—ভজন ছাড়িয়া, ঐ লোকালোক পারে, এক অজানা রাজ্যে বিহার করিতেছিল।

নানকীর মা ভাবিল, কনক গানের নেশায় মাতিয়াছে, সে মন্দির প্রদক্ষিণ করিবে না; থাকুক ফিরিবার সময় তাহাকে ডাকিয়া লইলেই হইবে। তাহারা মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া আসিয়া আবার কনককে ডাকিল, কনক তখনো বাহ্যজ্ঞানরহিত তন্ময় তদগত! হাত ধরিয়া টানিয়া তাহাকে উঠাইল, মুখের কাছে হেঁট হইয়া, হাত মুখ নাড়িয়া, বৃদ্ধা নানকীর মা, আবার তাহাকে বাড়ী ফিরিবার কথা বলিল! এতক্ষণে তাহার চৈতন্য ফিরিল, দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া সুপ্তোত্থিতের মত বিস্তৃত চক্ষে চাহিয়া বলিল,—"মন্দির প্রদক্ষিণ!"

"ওমা আমরা যে এই প্রদক্ষিণ করে এলুম।" "তোমরা প্রদক্ষিণ করেছ? আচ্ছা থাক, আমি শীগ্‌গির প্রদক্ষিণ করে আসছি।"

কি হাঁদা মেয়ে! তাহারা যখন ডাকিল তখন হাঁ করিয়া বসিয়া রহিল, তাহার পর এখন একলা চলিল! নানকীর মা বলিল, "তবে প্রদক্ষিণ করে এস, আমরা মন্দিরের ভিতর দিয়ে আর এক-বার ঘুরে যাই—" নানকীর মা ছেলেদের লইয়া ভিতরে চলিল।

কনক বাহিরে মন্দির প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। কয়বার প্রদক্ষিণ হইল তাহার হুঁশ নাই, কনক আপন মনে মন্দির ছাড়িয়া, রাস্তা ধরিয়া একলাই

ঝোঁকের ভরে চলিল। নান্কীর মার কথা তাহার মনেই নাই।

সোজা রাস্তা। বরাবর মাঠের রাস্তা পার হইয়া আসিয়া কনক গ্রাম্য পথ ধরিল; সে যে কতখানি রাস্তা পার হইয়া এখন কোন্ খানে আসিয়াছে, তাহা সে কিছুই বুঝিতে পারে নাই। আপন মনেই চলিয়াছে। গভীর তন্ময়তায় সে একেবারে মুহ্যমান!

নিস্তব্ধ প্রান্তরে, আলোর উপর আলো ঢালিয়া পূর্ণিমার চাঁদ আকাশের গায়ে হাসিতেছিল; কনক এতক্ষণ সেই আলোর দিকে চাহিয়া, নিজের ছায়া পিছনে ফেলিয়া, বরাবর চলিয়া আসিতেছিল। এখন সহসা গ্রাম্য পথে উঠিয়া পথিপার্শ্বস্থ বৃক্ষশ্রেণীর শাখা-পত্রান্তরালবিচ্যুত, খণ্ড বিভক্ত, অস্পষ্ট আলো দেখিয়া হঠাৎ তাহার চমক ভাঙিল। তাইত, আসিয়াছে কোথা! এরই মধ্যে এতখানি!

সঙ্গীরা কোথা? কনক পিছন দিকে চাহিল, কেহ নাই। নির্জ্জন পথে সে শুধু একাকী!—কনক থমকিয়া দাঁড়াইল, তাইত নান্কীর মা যে তাহাকে ডাকিয়া আনিতে বলিয়াছিল। তবে কি তাহারা নাই! না তাহাকে একলা ফেলিয়া তো তাহারা যাইবে না!

কনক সামনের রাস্তার দিকে চাহিল, অন্ধকারে বোধ হইল, একজন লোক সেইদিকে আসিতেছে। কনক উচ্চ গলায় বলিয়া উঠিল, "কে গা?"

বিধাতার বিড়ম্বনা! হঠাৎ সেই অস্ফুট অন্ধকার ভেদ করিয়া—উন্মাদচঞ্চলা ঝঞ্ঝা পবনের মত ছুটিয়া আসিয়া লোকটা সবলে কনকের বাহুদ্বয় চাপিয়া ধরিল এবং আবেগবিকম্পিত-কণ্ঠে স্নেহময় স্বরে ডাকিল, "কনু কনু তুমি—"

যুগপৎ সংঘটিত বিরুদ্ধ ঘটনাপরম্পরার উপর্য্যুপরি সংঘাতে কনক প্রথমটা হতভম্ব। তাহার পর অকস্মাৎ সবেগে এক ঝাপ্টা দিয়া সেই লোকটার কবল হইতে আপনাকে উদ্ধার করিয়া, ত্রস্ত কুরঙ্গিণীর মত লঘু লম্ফে, নিমেষ-মধ্যে পশ্চাতে হটিল; এবং বজ্রকঠোর স্বরে ডাকিল, "ভাইলাল!"

"হাঁ কনু, ভয় নাই, আমি ভাইলাল, আমি,——আমি তোমার বড়——"

তীব্র কঠোর ঘৃণার স্বরে উত্তর হইল, "আবার—আবার প্রবঞ্চনা! কৃতঘ্ন ধূর্ত্ত, আবার ফের!—সরে দাঁড়াও!"

পিছু হটিয়া কাতরকণ্ঠে ভাইলাল বলিল, "না না কনু ছলনা নয়, আমি যথার্থই বল্‌ছি, কিন্তু কি করে তোমায় বোঝাবো? কনু, কি বিপদেই আমি পড়েছি। ক্ষমতাশীলের প্রসাদাকাঙ্ক্ষায় নিজের স্বার্থসাধনের জন্ম এরকম গর্হিত কাজে—জেনে শুনে পাপে ডুবে আছি, ক্ষমা কর কনু ক্ষমা কর, তুমি আমায় ক্ষমা কর, আর দিন কয়েক অপেক্ষা কর—তার পর আমি তোমারি—" না না ও দুর্ব্বলতার গ্লানি আর নয়, মানুষ মানুষের আত্মীয়তা-প্রয়াসী!—ভুল!

চক্ষের জল কণ্ঠের কাতরতা, ওসব তো দক্ষ অভিনয়ের চূড়ান্ত নিদর্শন! সেও তো এতদিন অপরিসীম ব্যাকুলতায় ঐ বাধ্যতার পশ্চাতে যথেষ্ট খাটিয়াছে, তবে তবে...! নিষ্ঠুর বিদ্রূপের মর্ম্মভেদী হাসি কনকের অধরে ফুটিয়া উঠিল।—"ভাই-লাল, তুমি শুধু নরাধম নও, তুমি মহা অপদার্থ! কিন্তু তোমার ভুল হয়েছে ভাইলাল, আমায় আর প্রলোভনে লুব্ধ করতে পারবে না, যা হবার তা হয়েছে; কিন্তু তবুও বলছি, উপরদিকে চাও,—এ জীবনের পরেও জীবন আছে, মৃত্যুর পরও মৃত্যু আছে, এখনো ফেরো, এখনো আপনাকে সামলাও।"

কনক তীরবেগে চলিয়া গেল!

কুলিশনির্ঘোষে জলন্ত জ্বালাময়ী কঠোর আদেশ! বজ্রাহতপ্রায় ভাইলাল স্তব্ধ হতবুদ্ধি!

৫

তাহার দিনকয়েক পরেই একদিন পঞ্চায়েত-শক্তির প্রবল উৎপীড়নে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া হতভাগ্য ভাইলাল দেশ ছাড়িয়া পলাইল।

তাহার হঠাৎ নিরুদ্দেশের হুজুক লইয়া গ্রামে দিন কতক খুব আন্দোলন চলিল, কারণ পরিস্ফুট না হইলেও——মাতব্বর লোকেরা নিজেদের তীক্ষ্ণধার কল্পনা-শক্তির সাহায্যে চোখ টেপাটেপী করিয়া নানা অদ্ভুত সিদ্ধান্ত আবিষ্কার করিলেন.........।

কনক সকলই শুনিল; সে গভীর আশ্বস্ত-ভাবে বিঠোবার চরণোদ্দেশে ভক্তিভাবে প্রণাম করিল। তোমার অনন্ত করুণা প্রভু!

দিনকয়েকের মধ্যেই গ্রামময় রাষ্ট্র হইয়া গেল যে, প্রভু রাওয়ের কন্যা আজীবন কৌমার্য্য-ব্রত অবলম্বন করিয়া ভগবান বিঠোবাদেবের মন্দিরে সেবাব্রত-ধারিণী হইবে। সকলে অবাক!—কথাটা শুনিয়া কেহ হাসিল, কেহ কাঁদিল, কেহ বলিল দুর্ব্বুদ্ধি, কেহ বলিল নির্ব্বুদ্ধি, কেহ বলিল ...।

প্রভু রাওএর পরিবারবর্গ কিন্তু নিস্তব্ধ; প্রত্যুত্তর-প্রত্যাশী বিদ্রোহী দল তাহা দেখিয়া অত্যন্ত মনক্ষুণ্ণ হইলেন।

তারপর সত্যসত্যই এক উজ্জ্বল প্রভাতে ততোধিক পুণ্যোজ্জ্বল বেশে—গার্হস্থ্যাশ্রম ত্যাগ করিয়া, যথাশাস্ত্র সন্ন্যাস-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া ব্রহ্মচারিণী কনক, দেবসেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়া পল্লী ছাড়িয়া, আত্মীয়-পরিজন ছাড়িয়া, বিঠোবার মন্দির-পার্শ্বে ক্ষুদ্র কুটীরে আশ্রয় লইল।

৬

এই ঘটনার পর পাঁচ বৎসর কাটি-য়াছে। পৃথিবীর কাজ যেমনকার তেমনই চলিতেছে, অনেক জায়গায় অনেক পরিবর্ত্তনও ঘটিয়াছে। ইতিমধ্যে পঞ্চায়েত-কর্ত্তার মৃত্যু হইয়াছে, এবং পঞ্চায়েত বদল হইয়াছে। প্রভু রাওএর পরিবার আগের মতই আছে; ভাইলাল আজো নিরুদ্দিষ্ট।

প্রাতঃকাল। সদ্যস্নাতা গৈরিকধারিণী, সতীত্ব-লাবণ্য উদ্ভাসিতা, পুণ্য-গৌরবে মণ্ডিতা ব্রহ্মচারিণী কনক বিঠোবার মন্দির-পার্শ্বে ফুলবাগানে দেবপূজার পুষ্প চয়ন করিতেছিল। সমস্ত সদ্যপ্রস্ফুটিত পুষ্পগুলি সংগ্রহ করিয়া কনক পরিপূর্ণ শোভা সুন্দর সাজির পানে স্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া ঈষৎ হাসিল। সে কবে এমন ভাবে সম্পূর্ণ নিষ্কল হইয়া এমন করিয়া সারা জীবনের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য হৃদয়-দেবতার চরণে পরিপূর্ণ অসঙ্কোচে দান করিয়া নিজের কাছে মুক্ত হইবে!

মানবে যে মহত্ত্বের মূল্য বোঝে না, যে চ্যুত পূজার্ঘ্য তাহারা চরণে দলিয়া যায়, সেই অনাদৃত দান,—বড় অভিমানে বড় বেদনায় সে দেবতার দ্বারে বহিয়া আনিয়াছে। কিন্তু এখানেও যেন কি অব্যক্ত দ্বিধা জাগিতেছে! এ ভুল কেন ভগবান!—এ ভ্রান্তি সংহার কর, এ দানের সঙ্গে সে দানের পার্থক্য আকাশ পাতাল! সে ছিল উগ্র-শক্তি সুরা, আর এ যে পিষ্ট হৃদয়ের সার—সুধা! এ যে সন্তাপের আগুনে শোধন করিয়া লইয়াছে,—এ হৃদয়-শতদলের স্নিগ্ধ পরিমল-সম্ভার, এ শুধু তোমার! -সারা পৃথিবীর মধ্যে—জীবনের শেষের দান, শ্রেষ্ঠ সামগ্রী লইয়া ভক্ত দাঁড়াইয়া আছে, ওগো ভগবান, ইহার অধিকারী শুধু তুমিই! তবে কেন এখনো এ ব্যবধান, কেন এখনো এ কুণ্ঠা!

গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া, মাথা তুলিয়া কনক মন্দিরের পানে, বিহ্বল-বিস্ফারিত-নয়নে একবার তাকাইল! সহসা তাহার দুই চক্ষু দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া অশ্রু ঝড়িয়া পড়িল!

ফুলের সাজি-হস্তে কনক মন্দিরের সোপানের উপর আসিয়া বসিল। চক্ষু মুছিয়া বদ্ধাঞ্জলি হইয়া স্থিরদৃষ্টিতে মুগ্ধের মত অনেকক্ষণ দেবমূর্ত্তির পানে চাহিয়া রহিল। তাহার পর ধীরে ধীরে মন্দিরের সোপানের উপর তাহার মাথা লুটাইয়া পড়িল। ভগবান, যদি দয়া করিয়া দুঃস্বপ্ন হইতে জাগাইয়াছ, তবে আবার কেন মাঝে মাঝে তার মোহময় স্মৃতিঘোরের মধ্যে টানিয়া নিয়া যাও ঠাকুর! যদি দয়া করিয়াছ তবে আরো কর, একেবারে ছুটি দাও, সত্যকার মুক্তি দাও!—ত্যাগের মধ্যে জয়ের সন্ধানে চলিয়াছি ভগবান, জয় দাও—পরাজয়ের গ্লানি মোচন কর!"

কিছুক্ষণ পরে মন্দিরের পরিচারিকা অত্যন্ত ব্যস্তভাবে তথায় আসিল। পদ-শব্দে মাথা তুলিয়া কনক চাহিল, পরি-চারিকা দেখিল, তাহার চক্ষে গভীর ঘুমের গাঢ় আবেশ!

"মা শুনেছ গা আহা কোথাকার কে ভিন্ দেশী অচেনা লোক, একলা এসে বিঘোরে প্রাণটা হারালে বাছা!—"

কনক জিজ্ঞাসা করিল, "কে মা?"

"ঐ উত্তরদিকের মাঠে একটা লোক ওলাউঠায় মর-মর হয়ে পড়ে আছে, সঙ্গে এক প্রাণীও নেই, শুনছি নাকি বিঠোবা

দর্শনে আসছিল তার পর এই ব্যবস্থা। বিঠ্ঠল, কার মাটি কোথায় কেনা তা তুমিই জানো!

কনক ব্যগ্র হইয়া বলিল,—"সঙ্গে কেউ নেই?"

"হাঁ গো মা, আহা নিছক একলা!"

"বিঠোবার সেবাইত কেউ গেছে কি না?"

"এখনো কেউ খবর পায় নি, আমি এইমাত্র শুনে আসছি!"

কনক সাজিসুদ্ধ ফুল রাখিয়া, মনে মনে বিঠোবাকে নমস্কার করিয়া উঠিয়া পড়িল। মানুষের কাজের আগে দেবতার কাজ! চক্ষের সামনে এমন পূজার আয়োজন থাকিতে চক্ষু মুদিয়া অর্চ্চনার চেষ্টা আজ নিষ্ফল! দেবতা অন্ধ তোষামোদে তুষ্ট হইবার পাত্র নহেন, তাঁহার কাছে সাধনার পুরাপুরি মূল্য দিয়া তবে সিদ্ধিলাভ করিতে হয়! সকল দিকে!

কনক তখনি দুইজন সেবাইতকে সঙ্গে লইয়া ঘটনাস্থলে চলিল। আর এক ব্যক্তি চিকিৎসক আনিতে ছুটিল। তখনকার দিনে বিঠোবার সেবাইতদিগের নিকট অনাথ আতুরগণ সকল সময়ে সাহায্য পাইত।

তাহারা গিয়া দেখিল, প্রান্তর-মধ্যে একটি বৃক্ষতলে পড়িয়া রোগী যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছে। রোগের অবস্থা তখন অতি ভয়ানক, রোগীর চোখে খোঁদা পড়িয়াছে, কানে তালা ধরিয়াছে, হাতে-পায়ে আক্ষেপ হইতেছে, পেটের দারুণ যন্ত্রণায় দুর্ভাগা ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছে। সংক্রামক রোগের ভয়ে অগ্রসর হইতে না পারিয়া কয়েকজন হুজুকবাজ নিকর্ম্মা, দয়াপরবশ হইয়া তফাতে দাঁড়াইয়া আছে। রোগী জ্ঞানসঞ্চারে মাঝে মাঝে শুষ্ককণ্ঠে বলিতেছে,"জল জল—ওগো একটু জল!"

রোগীর মুখপানে চাহিয়া কনক স্তব্ধ হইয়া গেল। হাঁটু পাতিয়া নীচু হইয়া জন্মের মত, জীবনের মত—যেন ইহপরকালের মত সন্দেহ মিটাইয়া ভাল করিয়া একবার দেখিয়া লইল। তাহার পর! তাহার পর বেদনাজড়িত অস্ফুট উচ্চারণে, কাতরস্বরে বলিল, "একি প্রভু একি! একি হৃদয়বিদারক প্রলয়ঙ্কর রহস্য!"

মুমূর্ষু ব্যক্তি ভাইলাল! কনক উর্দ্ধে মুখ তুলিয়া চক্ষু মুদিল। তাহার বুকের ভিতর হইতে, অন্তরের অন্তর হইতে নিগূঢ় মর্ম্মবাণী উচ্ছ্বসিত হইয়া দেবতার চরণ-উদ্দেশে ছুটিল! সে ভাষা শব্দহীন, সে ভাব অনুভবের অতীত।

সামান্য মেঘের ঘোর কাটাইতে বিশ্ব-গ্রাসী ঝড়ের আয়োজন! দর্পণের প্রতিবিম্ব মুছিতে দর্পণই চূর্ণ করিবার আদেশ! কি অদ্ভুত! ইহাই অনন্ত মঙ্গলময় দেবতার অনন্ত শুভময় ব্যবস্থা! কনক যে আজই খানিক আগে, দেবতার পদে নতশিরে বাসনা জানাইয়াছিল "দয়া যদি করিয়াছ প্রভু, তবে আরো দয়া কর।" কে জানে এই ঘটনা বুঝি সেই প্রার্থনারই সমসূত্রে গাঁথা, একই অখণ্ড বিধান।

তাহাকে পিষিয়া চুরমার করিয়া, সকল

কুণ্ঠার কক্ষ হইতে মুক্ত করিয়া—দেবতার নিজস্ব করিয়া লইবার জন্যই বুঝি এ সৌভাগ্য শান্তির বেশে আসিয়াছে! তাই হোক ভগবান তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

কনকের চক্ষু হইতে দেবতার পূত আশীর্ব্বাদের মত, অলক্ত শোণিতের স্রোত যেন মর্ম্মের গ্লানি ধুইয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া অশ্রুরূপে খসিয়া পড়িল……। কনক শান্তমুখে রোগীর সেবা করিতে বসিল।

চিকিৎসক আসিয়া বিষণ্ণমুখে মাথা নাড়িলেন, বাঁচিবার আশা নাই।

কনক হাসিল। চিকিৎসকের অনুমতিক্রমে, সকলে মিলিয়া রোগীকে উঠাইয়া মন্দির-প্রাঙ্গণে—নাটমন্দিরে লইয়া আসিল। চিকিৎসক পাশে বসিয়া বহু যত্নে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে রোগের অবস্থা মিলাইয়া ঔষধ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সকলি বিফল, ক্রমশ রোগ প্রবল ও রোগী দুর্ব্বল হইতে লাগিল। অবশেষে হতাশ হইয়া চিকিৎসক অপরাহ্নের পর উঠিয়া গেলেন। সকলে বুঝিল সময় সন্নিকট।

সেদিন শুক্ল ত্রয়োদশী। সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই চাঁদের উজ্জ্বল আলোক সমস্ত ভুবন ভরিয়া উঠিল। চারিদিক ফুল্ল জ্যোৎস্না-স্নাত শুভ্র শান্তমূর্ত্তি! আর মন্দির প্রাঙ্গণে ততোধিক বিরাট অভিনব শান্তি!

অনেকক্ষণ পরে রোগী চক্ষু চাহিল। সকলে বুঝিল, এই শেষ। কনক তখনো রোগীর মাথা কোলে লইয়া বসিয়াছিল। রোগী কষ্টে মাথা ঘুরাইয়া ক্ষীণস্বরে বলিল, "কে?"

বিকৃতস্বরে কনক উত্তর দিল,—"দেবদাসী।"

"আমি কোথা?"

"ভগবান বিঠোবার মন্দিরে।"

রোগীর সর্ব্বশরীরে যেন জলন্ত তড়িৎ বহিয়া গেল! তাহার মৃত্যুম্লান বিবর্ণ মুখে সহসা একটা প্রোজ্জ্বল জ্যোতি ফুটিয়া উঠিল! রোগী অত্যন্ত সহজভাবে উঠিয়া বিঠোবার উদ্দেশে প্রণাম করিয়া, কনকের পদ-প্রান্তে নতশির হইল।

জনতা বিস্ময়ে স্তম্ভিত!

"গুরুরূপা জ্ঞানদাত্রী, আমার অপরাধ ক্ষমা কর, তোমার আদেশ পালন করেছি, এই উজ্জ্বল চন্দ্রালোকের নীচে, ভগবান বিঠোবাকে সাক্ষী রেখে আমি মুক্তকণ্ঠে বলছি, পাঁচ বৎসরের পরে আমি ফিরেছি, ফিরেছি, ফিরেছি!—জগৎ শুনুক আর না শুনুক, তাতে কিছু ক্ষতি নেই, কিন্তু আমি তোমায় আজ শোনাতে এসেছি দেবী, আজ আমি সকলের কাছ থেকে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে বিছিন্ন করে, একেবারে ফিরে চলেছি।"

আকস্মিক উত্তেজনায় সামর্থ্যের অতিরিক্ত শক্তিব্যয়ে দুর্ব্বল স্নায়ুমণ্ডলী তীব্র অবসাদে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। রোগী ঢলিয়া পড়িল। কনকের চক্ষু দিয়া আবার দুই বিন্দু অশ্রু ঝরিল। বেদনারুদ্ধকণ্ঠে কনক ধীরে ধীরে বলিল, "সংসারে তোমার মত যাদের তেজস্বী

প্রাণ তাঁরাই ধন্য ভাইলাল, ভালয় হোক্ মন্দয় হোক্, তোমরা যে-দিকে ঝোঁকো,—সেদিকে পূর্ণ শক্তিতেই ঝোঁকো, আত্মহারা হয়ে যাও! জগতে তাই তোমাদের সাধনাই এত দ্রুতসার্থক! তোমরা হয় পূর্ণ দেবতা, নয় পূর্ণ অপদেবতা হয়ে দাঁড়াও,—অপূর্ণ থাকতে পার না!...... আশীর্ব্বাদ কর ভাইলাল, অমনি পূর্ণ তেজস্বিতার মাঝে নিজের ক্ষীণতা বিসর্জ্জন করে, আমিও যেন আত্মজয়ী হতে পারি।......

ভাইলাল শান্ত-স্নিগ্ধ-দৃষ্টিতে আকাশের দিকে খানিকক্ষণ নীরবে চাহিয়া রহিল। তারপর মৃদুস্বরে বলিল, "আজ জীবনের শ্রেষ্ঠ দিন, বড় মঙ্গলময় মুহূর্ত্তে বিঠোবার দ্বারে আমার মহাশয্যা রচিত হয়েছে। কি অপরিসীম আনন্দ! আজ আমার অবশিষ্ট আর কিছু নেই, আছে শুধু হে বিঠোবা দেব, তোমার পাদপদ্মে বিলীন হবার জন্য শুধু একটি মুহূর্ত্ত!"

ভাইলালের ললাটে তখন বেদনা, ক্ষোভ, ক্লান্তির চিহ্ন কিছুমাত্র ছিল না! ছিল শুধু সুধনা-সিক্ত, স্বর্গীয় তৃপ্তির একটি অপরূপ দীপ্তি!

উন্মুক্ত আকাশের তলায় বুকের উপর যুগ্ম হস্ত স্থাপন করিয়া, ভগবানের চরণ ধ্যান করিতে করিতে ভাইলাল মহা সমাধিতে মগ্ন হইল। চারিদিকে উজ্জ্বল ত্রয়োদশীর চন্দ্রালোক পরিপূর্ণ শোভায় হাসিতেছিল। সুধাকর-কর-সম্পৃক্ত সমীরণ জগতের চক্ষে স্নিগ্ধ পরশ বুলাইয়া বহিতে লাগিল। মন্দির-সোপানে উপবিষ্ট এক জ্ঞানী সাধক বদ্ধাঞ্জলি হইয়া গদগদ কণ্ঠে গাহিতেছিলেন;—

"ন জাতোঽহং মৃতোবাপি—
নাস্ত কর্ম্ম শুভাশুভম্,
বিশুদ্ধং নির্গুণং ব্রহ্ম
বন্ধো মুক্তি কথং মম।"

সমাপ্ত।

শ্রীশৈলবালা ঘোষ জায়া।

বারাণসী-তত্ত্ব।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

দেশাচার। বারাণসীর চতুর্দ্দিকে যেরূপ আচার দৃষ্ট হয়, বারাণসীরও দেশাচার তদনুরূপ। অতি অল্প বয়সেই বিবাহ ক্রিয়া সমাধা হইয়া থাকে। সাধারণতঃ ৫ হইতে ৯ বৎসরের মধ্যে বিবাহ হইয়া যায়। উচ্চ জাতির মধ্যে বিবাহের বয়স ১১ হইতে ১৫। এদেশে বর অপেক্ষা কন্যা বয়সে বড় হইয়া থাকে। অল্প বয়সে বিবাহ হইলেও দ্বিরাগমন ব্যতীত কন্যাগণ স্বামীর বাটীতে যাইতে পান না। সুতরাং স্বাস্থ্য-ভঙ্গের আশঙ্কা আদৌ নাই। সম্ভ্রান্ত অথবা মধ্যবিৎ ব্যক্তিদিগের মধ্যে বিধবাবিবাহের প্রথা নাই; নিম্নশ্রেণীস্থ ব্যক্তিদিগের মধ্যে এই প্রথা সীমাবদ্ধ।

কোনো কোনো মধ্যবিৎ ব্যক্তি বিধবা-বিবাহ দিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাদিগের সংখ্যা অতীব ন্যূন। ব্রাহ্ম এবং পাহ্‌লিয়া শিখ সম্প্রদায়ের মধ্যে অন্য জাতিকে আপন দলভুক্ত করার প্রথা দেখা যায়। ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে হইলে ভগবানের নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রথানুসারে যাবতীয় অনুষ্ঠানাদি করিবার জন্য প্রতিশ্রুত হইতে হয়। আচার্য্য নিরাকার পরমেশ্বরের মহীয়সী শক্তির বর্ণনা করেন। অনন্তর সেই নিরাকার পরমপিতার চরণকমলে আপনাদিগকে সমর্পণ বিষয়ক একটি গান হইয়া দীক্ষানুষ্ঠান শেষ হয়। দীক্ষিত ব্যক্তিকে অবশ্য যজ্ঞোপবীত, কণ্ঠী প্রভৃতি জাতিভেদসূচক সাম্প্রদায়িক চিহ্নগুলিকে পরিত্যাগ করিতে হয়।

পাহ্‌লিয়া শিখ স্বীয় দলভুক্ত করিতে হইলে নবাগতের গলায় একখানি তরবারী ঝুলাইয়া তাহাকে আচার্য্যের সম্মুখে দাঁড় করায়। অতঃপর আচার্য্য একটি সরবৎ (চিনির পানা) লইয়া তাহাতে ছুরি ডুবাইয়া কতকগুলি বাক্য উচ্চারণ করেন। অতঃপর সেই সরবতের ছিটা আগন্তুকের মস্তকে দিয়া অবশিষ্টাংশ তাহাকে পান করায়। অনন্তর নবাগত ব্যক্তি আচার্য্যের দক্ষিণ পদের বৃদ্ধাঙ্গুলি কিঞ্চিৎ জলে নিমজ্জিত করাইয়া সেই চরণামৃত পান করে।

হিন্দু এবং জৈন স্বীয় স্বীয় ধর্ম্মশাস্ত্রে বিশ্বাস রাখেন। বৌদ্ধগণের ত্রীপিঠকই বিশ্বাস্য। শিখ আদিগ্রন্থে এবং মুসলমান কোরাণে আস্থাবান্। হিন্দু শিখ এবং জৈন পুর্ব্বাস্য হইয়া ভগবানের আরাধনা করে; মুসলমান মক্কার দিকে মুখ ফিরায়। পূর্ব্বোক্ত জাতিত্রয় ধর্ম্মমন্দিরে এবং শেষোক্ত জাতি মস্‌জিদে উপাসনা করে। হিন্দু, শিখ এবং জৈনদিগের পুরোহিত ব্রাহ্মণ, তাহারা দ্বারপরিগ্রহ করিতে পারে। বৌদ্ধগণের যাজকগণ অবিবাহিত থাকে। মুসলমানগণ স্বীয় সঙ্ঘ হইতে যাজক নির্ব্বাচিত করে। গোজাতি হিন্দুগণের আরাধ্য সুতরাং অখাদ্য। এবং আমিষাহার হিন্দুর নিষিদ্ধ। শিখগণ গোজাতির প্রতি অধিকতর ভক্তিমান্ কিন্তু আমিষ ভোজনে তাহাদিগের বাধা নাই। মুসলমানগণ শূকর এবং কুকুরকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকে এবং ইহাদিগের মাংস তাহাদিগের নিকট অভক্ষ্য। বৌদ্ধ এবং জৈন প্রাণিহত্যা করে না। অনার্য্য ব্যক্তি ব্যতীত মৃত পশুর মাংস কেহই ভোজন করে না। শিখ তামাকুসেবনে বিরত থাকে, কিন্তু মাদক দ্রব্যে বীতস্পৃহ নহে। মাদক দ্রব্য হিন্দুর নিষিদ্ধ নহে—মুসলমানের বটে। হিন্দু এবং জৈন মস্তক মুণ্ডন করে, কিন্তু শিখা কর্ত্তন করে না। কেশ বা শ্মশ্রু কর্ত্তন শিখের পক্ষে নিষিদ্ধ। দাড়ি মুসলমানের মান্য পদার্থ। মস্তক মুণ্ডনে মুসলমানদিগের নিষেধ নাই; শিখা ধারণ তাহাদিগের পক্ষে অবিধি। হিন্দু, শিখ এবং জৈন কোটের বোতাম ডান দিকে এবং মুসলমান বাম দিকে রাখে। হিন্দু এবং জৈন পুরুষগণ ধুতি পরিধান

করে, শিখ জানু পর্য্যন্ত পাজামা পরে। মুসলমানগণের পাজামা ঢিলা। হিন্দু এবং বৌদ্ধদিগের নিকট লাল বা গৈরিক রঙের বস্ত্র পরিধান অবিধি নহে, তবে নীল রং হিন্দুর অবিধি। শিখগণ নীল বা শ্বেতবর্ণ পরিচ্ছদের পক্ষপাতী; কিন্তু গৈরিক রং তাহাদিগের নিকট ঘৃণ্য। মুসলমানগণেরও অনুরূপ প্রথা দৃষ্ট হয়। হিন্দু এবং জৈন মৃণ্ময় পাত্রে রন্ধন এবং পানাহার করে বটে, কিন্তু সেই পাত্রে আঁজি থাকা আবশ্যক। ধাতুপাত্র হইলে তাহা কাংশ বা পিত্তলের হওয়া চাই। মুসলমানদিগের মৃণ্ময় পাত্রে পানাহার নিষিদ্ধ নহে বটে, কিন্তু পাত্রে আঁজি কাটা হইবে না। ধাতু পাত্র হইলে তাহা তাম্রের হওয়াই বিধি। হিন্দু এবং শিখ প্রত্যহ স্নান করে; মুসলমান এবং বৌদ্ধের দৈনিক স্নানের নিয়ম নাই।

হিন্দু জৈন এবং শিখ অগ্নি-সাক্ষী করিয়া বিবাহ করে। মুসলমানগণ উভয় পক্ষের মত লইয়া লোক সাক্ষী রাখিয়া দার-পরিগ্রহ করে। মুসলমানদের ত্বকচ্ছেদ একটি বিশেষ বিধি। শিখগণ বাপতিস্মা গ্রহণ করে। হিন্দু জৈন এবং শিখ শব দাহ করে, মুসলমান সমাধি দেয় এবং বৌদ্ধগণ হয় পুড়িয়া ফেলে, নয় ফেলিয়া দেয়। কৃষকপত্নীগণ মাঠে স্বামীর সাহায্য করে। ব্রাহ্মণ কিম্বা ক্ষত্রিয়-রমণীর সে প্রথা নাই বলিয়া কৃষিকার্য্যে ভাড়াটিয়া লোক রাখিতে হয়। গৃহস্থালীকার্য্য মাত্রই স্ত্রীগণের অধিকৃত। গৃহকার্য্যে ত্রুটি হইলে রমণীগণ পুরুষদিগের নিকট হইতে তিরস্কৃত, এমন কি প্রহৃত হইয়া থাকে। নীচ রমণীরা পক্ষান্তে বারা শাসা। একাধিক বিবাহ হিন্দু পুরুষদিগের নিষিদ্ধ নহে। রমণীগণ বয়স্থা অথবা অপুত্রক হইলে স্বামীকে অন্য বিবাহ করিতে পরামর্শ দেয়, কারণ তাহাতে তাহাদিগের গৃহকার্য্যের লাঘব হইয়া থাকে। বহুবিবাহ মুসলমানগণের নিষিদ্ধ নহে; সুতরাং তাহাদিগের অপত্যও অধিক হইয়া থাকে।

সভা-সমিতি। সাহিত্য এবং ধর্ম্ম সমিতিতে বারাণসী পূর্ণ। তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা যেটি প্রধান, তাহার নাম কারমাইকেল-লাইব্রেরি। ইহা ১৮৭০ খৃঃ প্রতিষ্ঠিত। কারমাইকেল সাহেবের হুকুমে বাটীনির্ম্মাণের জন্য মিউনিসিপালিটি হইতে এক সহস্র মুদ্রা প্রদত্ত হয়। লাইব্রেরির আয় ১৯০০ টাকা। এই লাইব্রেরিতে "কাশী সুজন সমাজ" নামে একটি সমিতির অধিবেশন হইয়া থাকে। কাশীর সমধিক উন্নতি করাই উক্ত সমিতির উদ্দেশ্য। হিন্দি ভাষার উন্নতি কল্পে "নাগরী প্রচারিণী সভা" ১৮৯৩ খৃঃ স্থাপিত হয়। ইহার সভ্য-সংখ্যা ১৫০০ এবং বার্ষিক আয় ছয় সহস্র মুদ্রা। ইংরাজ সরকারও এই সমিতিকে সাহায্য প্রদান করিয়া থাকেন। মিত্রগোষ্ঠী নামে একটি সাহিত্য-সমিতি ১৯০২ খৃঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। সংস্কৃত শিক্ষাবিস্তারই এই সমিতির উদ্দেশ্য। সমিতির স্বীয় বাটী নাই এবং

আরও অল্প। বান্ধবসমিতি এবং সঙ্গীত সমিতি নামে বাঙালীদিগের দুইটি সমিতি আছে। ইহার সভ্যগণ বাঙালী। থিওসোফিক্যাল সোসাইটী নামে একটি সমিতি আছে। বিবি এ্যানিবেসান্ত ইহার সভাপতি। সমিতির সভ্য-সংখ্যা প্রায় পাঁচ সহস্র। শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডল নামে হিন্দুদিগের একটি বৃহৎ সভা আছে। ইহার উদ্দেশ্য হিন্দুধর্ম্ম প্রচার। সভ্য-সংখ্যা অনূন সাত সহস্র। দ্বারভাঙ্গাধীপ ইহার সভাপতি। এই সভার সহিত ভারতবর্ষীয় ধর্ম্ম প্রচারিণী সভা সম্মিলিত। ব্রহ্মশঙ্কর নামে একটি ধর্ম্মসভা বারাণসী ধামে প্রধান আড্ডা করিয়াছে। ইহার একটি বৃহৎ এবং সুন্দর অট্টালিকাও আছে। এতদ্ব্যতীত আর্য্য সমাজও দৃষ্ট হইয়া থাকে।

উদ্যান। বারাণসীধামে অনেক উদ্যান আছে। তাহাতে সাধারণতঃ আম্রবৃক্ষই দেখা যায়। বারাণসী আমের জন্যই বিখ্যাত। উত্তমোত্তম পেয়ারা বারাণসীতে পাওয়া গিয়া থাকে। বাঁশ গাছও ভূরি দৃষ্ট হয়।

খনিজ পদার্থ। খনিজ পদার্থের মধ্যে যাহা মানবের ব্যবহারে আইসে তাহাদের নাম কঙ্কর, মৃণ্ময় ইষ্টক এবং "রে"। এতন্মধ্যে শেষোক্ত পদার্থটি উষর জমিতে দেখা যায়। 'রে' দেখিতে ঠিক লবণের ন্যায়। দেশী কাচ প্রস্তুতের জন্য "রে"র আবশ্যক হইয়া থাকে। রজকগণ সাবানের পরিবর্ত্তে "রে" ব্যবহার করিয়া থাকে। কঙ্করের খনি জেলার প্রায় সকল স্থানেই পাওয়া যায়। জমির চার ফিট নীচে কঙ্কর প্রাপ্তব্য। কঙ্কর চারি প্রকারের; যথা বিছোয়া, গাখিয়া, মাটিময়লা বা পাকালোয়া এবং ছাওয়ান। প্রথম দুইটি রাস্তা প্রস্তুতের জন্য ব্যবহৃত হয়। বিছোয়া এবং মাটিময়লা জ্বালাইয়া চূণ প্রস্তুত হইয়া থাকে। ছাওয়ান কঙ্কর কেবলমাত্র পুঁতিবার কার্য্যে আইসে। বিছোয়া এবং গাখিয়া কঙ্করের আকর গঙ্গার বাম তটে চৌবেপুর, চক্রৌতি, টিক্রি এবং দক্ষিণ তটে বালুয়া, তাণ্ডা, ছমিয়ান এবং ভেন্সা; বরুণা-তীরে —রামেশ্বর এবং কোটা—চন্দৌলি তহশীল, আলিনগর, কান্দেরি, গঙ্গাপুরে ভিখিপুর ও ঘাগানপুর এবং বারাণসী তহশিলে ফুলপুর, সরাইকাজি, দাসুপুর, বরৌণী, ছুপেপুর, গোঁসাইপুর, নরপত-পুর নামক স্থানে দৃষ্ট হইয়া থাকে। মাটিময়লা কঙ্কর উল্লিখিত স্থানচয়ে পাওয়া যায়। ছাওয়ান কঙ্কর আলি-নগর, তেন্সা এবং বালুয়া ভিন্ন অন্য কোনো স্থানে দেখা যায় না। আকর হইতে কঙ্কর নিষ্কাশনের খরচা পদার্থ-কাঠিন্যে দেড় টাকা হইতে দুই টাকা পর্য্যন্ত প্রত্যেক এক শত ঘনফুটে পড়িয়া থাকে। মাইল প্রতি গাড়িভাড়া আট আনা হইতে বারো আনা পর্য্যন্ত; বারাণসীতে কঙ্কর নীত হইলে ৪॥৹ টাকা হইতে ৫॥৹ টাকা পর্য্যন্ত পড়ে। প্রত্যেক একশত ঘন ফুট ভাল কঙ্করের চূণ ২০।২১ টাকায়

পাওয়া যায়। ইষ্টক অনেক স্থানেই তৈয়ার হয়। ইষ্টকবিশেষে এক সহস্রের দাম ৫ টাকা হইতে ৮॥০ টাকা পর্য্যন্ত।

সপ্তদশ অধ্যায়।

ইতিহাস।

বেদব্যাস-প্রণীত কাশীখণ্ডে বারাণসীর সৃষ্টিসম্বন্ধে এরূপ লেখা আছে যে, একদা সপ্তর্ষিগণ বিষ্ণুর নিকট সমাগত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভগবন্ সাধারণ মানব সকল কিরূপে সহজে মুক্তিপ্রাপ্ত হইতে পারে? কারণ ঋষিরা কঠোর তপস্যা করিয়াও যখন ষড়রিপুকে সম্পূর্ণ বশ করিতে সমর্থ হইলেন না, তখন সাধারণ মানব কিরূপে পারিবে। বিষ্ণু চিন্তা করিয়া একটি লিঙ্গমূর্ত্তি সৃজন করিলেন। তখন তাহা হইতে জ্যোতি নির্গত হইতে লাগিল। সৃজনকালে লিঙ্গ অর্দ্ধহস্ত পরিমিত ছিল, কিন্তু ক্রমশ বর্দ্ধিত হইয়া পঞ্চ ক্রোশ অধিকৃত করিল। ইহাই কাশী নামে খ্যাত। পৃথিবী এককালে জলে নিমগ্ন ছিল এবং লিঙ্গ সেই জলের উপর অচলভাবে অবস্থিতি করিলে বিষ্ণু দেখিলেন যে, স্থানটি ঋষিগণের আশ্রমের পক্ষে অতি সামান্য সুতরাং পৃথিবী সৃজন করিয়া লিঙ্গের চতুষ্পার্শ্বে স্থাপন করিলেন। এতদ্ধেতু কাশী পৃথিবীর কেন্দ্রস্বরূপ। পুরাতন কাশীর সীমার নিদর্শনস্বরূপ পঞ্চক্রোশী রাস্তা এখনো বিদ্যমান আছে।

কাশীর সৃষ্টি যে সময় হউক না কেন, পৌরাণিক সময়ে ইহার যে আদর অধিক ছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কাশী দুইটি নামে খ্যাত, যথা কাশী এবং বারাণসী। কাশী শব্দের উৎপত্তি বোধ হয় কাশ শব্দ হইতে হইয়াছে। পুরুবংশ-সম্ভূত কাশ নামক জনৈক রাজা হইতে কাশীর উদ্ভব হওয়াই সম্ভব। হরিবংশে কাশীরাজদিগের যে তালিকা আছে, তাহাতে দেখা যায় যে, কাশ নামক জনৈক রাজা পুরুর চতুর্থ পুরুষ নিম্নে। কাশী যে কোন্ সময় বারাণসীতে পরিণত হইয়াছে তাহা বলা সুকঠিন। পুরাণ, কাশীমাহাত্ম্য এবং কাশীখণ্ডে বারাণসীর স্থান বরুণা এবং অসির মধ্যে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং বরুণা এবং অসি শব্দযোগে বারাণসী শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। কাশীখণ্ডে লেখা আছে যে, কাশীর অধীশ্বর মহাদেব; কিন্তু তিনি কৌশল দ্বারা রাজ্যভ্রষ্ট হন। মহাদেবের অনুপস্থিতিতে দেবগণ যখন নর্ম্মদা নদী-তীরে নূতন কাশী প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সভা করেন। ব্রহ্মা সেই অবসরে তাঁহার ভক্ত দিবোদাসকে কাশীরাজ্য অর্পণ করেন। মহাদেব প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার স্বরাজ্যে তাঁহার প্রবেশাধিকার আর নাই। মহাদেবের চর ধুন্দীরাজ দিবোদাসকে কোনরূপে পাপকার্য্যে রত করাইয়া তাহার দেবশক্তি অপহরণ করেন। এই সুযোগে মহাদেব দেববর্গে পরিবৃত হইয়া কাশী প্রবেশ করিয়া দিবদাসকে রাজ্যচ্যুত করেন। কলির প্রারম্ভ পর্য্যন্ত মহাদেব রাজত্ব করিয়া

অবিমুক্তেশ্বরকে রাজ্য সমর্পণ করত কৈলাসে গমন করেন। তদবধি কাশী অবিমুক্তেশ্বরের হস্তে আছে।

রামায়ণ ও মহাভারতে উক্ত আছে যে, বারাণসী কাশীরাজদিগের আবাসভূমি ছিল। কাশীর রাজাদিগের মধ্যে পুরণ প্রতিষ্ঠানে রাজত্ব করিতেন। প্রতিষ্ঠান এখন এলাহাবাদ নামে খ্যাত। ভাগবত পুরাণে কাশী কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধীভূত। আখ্যায়িকায় পুণ্ডরীক কাশীর এবং কৃষ্ণ দ্বারকার রাজা ছিলেন। উভয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকায় পুণ্ডরীক কৃষ্ণকে রণে আহ্বান করেন। ফলে পুণ্ডরীক হত হন। তাঁহার পুত্র সুদক্ষও পিতৃবৈরী নিধন করিতে গিয়া যমলোকে পিতার অনুগামী হন। কৃষ্ণের সুদর্শন এই সময়ে কাশীকে দগ্ধ করে। ইতিহাস বলেন যে, মহাভারতের বীর ভরত কাশীর রাজা ছিলেন। তাঁহার কেল্লা বড়া পরগণার বৈরন্ত নামক গ্রামে ছিল। অদ্যাপি সেই দুর্গের ধ্বংসাবশেষ আমাদিগের নয়নপথের পথিক হয়। রাজা ভরত পাণ্ডবদিগের সহায় ছিলেন। তিনি এবং তাঁহার আত্মীয়বর্গ ঐ যুদ্ধে হত হন।

হিন্দুর ইতিহাস এই পর্য্যন্তই শেষ। পরে শাক্যমুনির আবির্ভাব হয়। ধর্ম্ম প্রচারের জন্য বারাণসীধামই তাঁহার কেন্দ্র ছিল। সারনাথে তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন এখনো দৃষ্ট হইয়া থাকে।

অতঃপর ভর এবং সৈরীগণের অভ্যুদয় হয়। গঙ্গার দক্ষিণ দিকে যে সকল ধ্বংসপ্রাপ্ত দুর্গ দেখা যায়, তাহা সৈরীগণের বলিয়া খ্যাত। বারাণসী জেলার অন্যান্য স্থান ভরদিগের অধিকৃত ছিল। অতঃপর কান্যকুব্জের রাজাগণ এবং পাটনার রাজাগণ কাশীর উপর আধিপত্য বিস্তার করেন। গুপ্ত রাজাদিগের স্মৃতিচিহ্ন অদ্যাপি সৈয়দপুরে দৃষ্ট হইয়া থাকে। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দিতে বারাণসীধামে সহারওয়ার রাজপুতগণ শাসনদণ্ড লইয়া সমাগত হন। এই বংশের শেষ রাজার নাম বনর। ইঁহার দ্বারা রাজঘাটের দুর্গ নির্ম্মিত হয়। এই দুর্গটি বরুণা এবং গঙ্গার সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। রাজা বনর মামুদ গজনবী দ্বারা হত হন। সহরওয়ার রাজপুতদিগের পতন হওয়ার পর বারাণসীধামের কতকটা কান্যকুব্জের রাঠোর রাজাদিগের হস্তে আইসে। এই বংশের শেষ রাজা জয়চাঁদ। অদ্যাপি তাঁহার তাম্রফলক আমাদিগের নয়নপথের পথিক হয়। রাজা জয়চাঁদ সাহাবুদ্দিন মহম্মদ ঘোরী দ্বারা নিহত হন। অতঃপর বহ্লুল লোদী বারাণসীধামকে দিল্লীর সম্রাটের রাজত্বভুক্ত করেন। ১৫২৯ খৃঃ কাশী বাবরের হস্তগত হয়। অতঃপর আকবরসাহ বারাণসীধামকে স্বীয় এলাহাবাদ সরকারভুক্ত করেন। আকবরের রাজত্বকালে বারাণসীধামে অনেক মন্দির প্রতিষ্টিত হয়। জয়পুরের রাজা জয়সিংহ এই মন্দিরগুলির প্রতিষ্ঠাতা। সাজাহান তাঁহার পুত্র দারাসিকোকে বারাণসী

ধামের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। ইনি উপনিষদের এক তরজমা করেন। উহার ভূমিকায় লেখা আছে যে তিনি উক্ত কার্য্যের জন্য ১৫০ জন দণ্ডী নিযুক্ত করেন। পরে দুর্দ্দান্ত ঔরঙ্গজেব মন্দির দেখিলেই ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিলেন এমন কি কাশীর নাম পর্য্যন্ত লুপ্ত করিবার জন্য তাহার মহম্মদাবাদ নাম দিলেন। সংসারের কিছুই চিরস্থায়ী নহে; সুতরাং মহম্মদাবাদ নাম কালে লোপ পাইল, পুনরায় হিন্দুর কাশীর নাম কাশীই রহিল। মনসারাম এবং বলবন্ত সিংহ বিলোপোন্মুখ কাশীকে পুনর্জ্জীবিত করিলেন।

১৭৭৫ খৃঃ হইতে ইংরাজরাজের অভ্যুদয় হয়। তদবধি কাশী ইংরাজ দিগের হস্তে আছে।

পরিশিষ্ট।

নদীগর্ভ

বারাণসীধামের যদি কিছু দৃশ্য দেখিতে চাও তবে একবার প্রাতঃকালে গঙ্গাতটে আসিও। দেখিবে সূর্য্যদেব আরক্তিম বর্ণে প্রাচীদিক উদ্ভাসিত করিয়া উদিত হইয়াছেন গঙ্গাগর্ভ হইতে বাষ্পরাশি উত্থিত হইয়া ক্রমে আকাশে বিলীন হইয়া যাইতেছে। প্রাচী উষাদেবীর আরক্তিম বসনে সজ্জিত হইয়া উদয়োন্মুখ সূর্য্যদেবকে আবাহন করিতেছেন! গঙ্গাপুত্রগণ স্নাতকদিগকে নানারূপ কণ্ঠস্বরে আহ্বান করিতেছে। দেখিতে দেখিতে সূর্য্যদেব স্বীয় কিরণজাল বিস্তার করিলেন। সেই আলোকে দিগ্দগন্ত উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। পক্ষিগণের কলরব, জলে স্নাতকদিগের ঝপ ঝপ শব্দ, নরনারীগণের ইতস্তত পদসঞ্চরণ, ঘাটিয়াগণের আহ্বানধ্বনি, বায়ুকম্পিত মন্দিরের ধ্বজা-পতাকার আন্দোলন এবং ব্রাহ্মণদিগের বেদগান প্রভৃতিতে দৃশ্যটিকে অতি মনোরম করিয়া তুলিয়াছে রমণীগণ সাজিতে পুষ্পমালা লইয়া দলে দলে বহির্গত হইতেছে। অদূরে মণিকর্ণিকাঘাটে শবদাহ-জনিত ধূমরাশি উত্থিত হইতেছে। গঙ্গাগর্ভে সন্ন্যাসিদেহ-লোলুপ গৃধ্রগণ পরস্পর পরস্পরের সহিত কলহ করিতেছে। ঘাটে স্নানের পরও বিশেষ বিশেষ দৃশ্য আমাদিগের নয়নপথের পথিক হয়।

ষ্টেষণ হইতে জনপ্রবাহ দেখিয়া বুঝিতে পারিবে যে, কাশী হিন্দুদিগের কিরূপ পূজ্য। সহরের মধ্যে সন্ন্যাসিগণ বিবিধবর্ণের বস্ত্রে ভূষিত হইয়া ইতস্তত ধাবমান হইতেছে দেখিতে পাইবে। কৌপীনধারী হইতে গেরুয়াবসনপরিহিত সন্ন্যাসিগণ, কেহ বা কমণ্ডলু, কেহ বা দণ্ড ধারণ করিয়া ঘরে ঘরে ভিক্ষার্থে ঘুরিতেছে। সহরে যেন আনন্দ উথলিয়া পড়িতেছে।

সমাপ্ত।

শ্রীমতী হেমন্তকুমারী দেবী।

আমাদের কথা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বিজ্ঞানের অনমুমোদিত যে ধর্ম্ম, তাহা অধর্ম্ম। অতএব বিদ্যাসাগর যা বলেছেন তাই গ্রাহ্য ;—কন্যার পুনর্বিবাহ কালে জন্মদাতার গোত্রেরই উল্লেখ হবে, কারণ সেই বংশে তার জন্ম এ বিষয়ে ভুল নেই। যখন স্বামি-কুল ত্যাগ করে' স্বামিকুলের সঙ্গে সম্বন্ধ "অস্বীকার" করে' তিনি পুনরায় বিবাহে সম্মতা হয়েছেন, এবং পিতৃকুলে এসে আশ্রয় নিয়েছেন, তখন পুনরায় তিনি পিতৃগোত্রে স্থিতা হয়েছেন ; অতএব পুনর্বিবাহকালে পিতৃগোত্রেরই উল্লেখ হওয়া উচিত।

চন্দ্র। তবে তো মেয়েরা ইচ্ছে করলেই যখন-তখন পিতৃগোত্রে ফিরবে?

হরি। যখন-তখন কেন? যদি নিঃসন্তান অবস্থায় স্বামীর মৃত্যু হয়, এবং যদি সেই বিধবা ইচ্ছা করেন, (ইচ্ছা করলে অবশ্য স্বামীগোত্রে থেকে ব্রহ্মচর্য্য পালন করতে পারেন) তবে তিনি পিতৃ-গোত্রে আসতে পারেন, নতুবা নয়।

চন্দ্র। তুমি যে এতক্ষণ বাক্‌চাতুরী করলে, কিন্তু শাস্ত্রের নজির তো একটিও দিলে না!

হরি। অনাবশ্যক বোধে।

চন্দ্র। শাস্ত্রের নজির অনাবশ্যক! এই আমি চল্লুম, তোমাদের সঙ্গে একত্রে উপবেশনেও পাপ আছে।

হরি। বসুন বসুন, রাগ করবেন না। একটা কথা শুনুন।

চন্দ্র। তোমার মাথা-মুণ্ড কি বলবে বল। আর কচ্‌কচি ভাল লাগে না—বেলা হ'য়েচে।

হরি। দেখুন, প্রথমত যদি নিরপেক্ষ ভাবে এবং হৃদয়হীন না হয়ে বিচার করি তবে দেখতে পাই যে, বর্ত্তমানে বিধবা-বিবাহ প্রচলন হওয়া উচিত। যখন বিধবা-বিবাহ প্রচলন করাই বর্ত্তমানে সম্পূর্ণ উচিত এবং সমাজের কল্যাণকর, তখন ব্যবস্থাও বাহির করা যাবে, "এবং গিয়েছে। অবশ্য আমি শাস্ত্রের অনমুমোদনে এমন একটি গুরুতর ব্যাপারে অগ্রসর হতে পরামর্শ দিই নে। মায়ের জাত, লক্ষ্মীর জাত, স্ত্রীজাতির প্রতি নৃশংস হয়ে, তাঁদের উপর অত্যাচার প্রভুত্ব নিষ্ঠুরতা অক্ষুণ্ন রাখবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়ে, নিজে সুখভোগ করব বলে তর্ক সুরু করলে, কারো বাপের সাধ্য হবে না যে, তাঁকে তর্কে পরাস্ত করবে। কিন্তু তাই কি মনুষ্যত্ব?

চন্দ্র। কিন্তু বিধবাবিবাহ আরম্ভ হলে, পবিত্র সমাজটা কেমনতর হ'য়ে দাঁড়াবে, একবার ভেবে দেখ দেখি। হায়, হায়, হিন্দুর এমন সুন্দর আদর্শ—এ তোমরা ভাঙ্‌তে চাও?

হরি। ভাঙ্‌তে চাইনে; আদর্শ রক্ষা করতে কারো নিষেধ থাকবে না। এখন ব্রাহ্মণেরা ম্লেচ্ছের দাসত্ব করচেন বলে অধ্যাপক, নিষ্ঠাবান ব্রহ্মচারী ঋষিতুল্য ব্রাহ্মণ হবার কারো নিষেধ নেই—আছেনও অনেক। ব্রহ্মচারিণী বালবিধবা চিরকালই আমাদের চক্ষে দেবী-সদৃশা বরণীয়া এবং পূজ্যা থাকবেন। যিনি আপন কন্যা ভগ্নী অথবা পিতৃকুলে উত্তম আশ্রয় হীনা পুত্রবধূ অথবা ভ্রাতৃবধূকে উপযুক্ত-রূপ ব্রহ্মচর্য্যপালন শিক্ষা দিয়ে, তাঁদের স্বর্গের অধিকার অক্ষুন্ন রাখতে সাহায্য করবেন, তিনি নিজেও পূজনীয়, পুণ্যাত্মা এবং স্বর্গের অধিকারী। আদর্শ ভাঙার কথা বলছেন, কিন্তু আপনারা কালের স্রোতে কোথায় এসে পড়েছেন? নিজেরা কালের সঙ্গে সঙ্গে অনেকটা চলে এসেছেন, মাঝে পড়ে এই বেচারীদের কোথায় ফেলে রেখে আসতে চান? থাকতে পারবে কেন? আপনাদের মধ্যেই স্ত্রীলোকদিগকে বর্দ্ধিত প্রতি-পালিত হতে হয়, আপনাদের হাতেই তাঁদের শিক্ষা-দীক্ষা, আপনারা যদি একটুও ব্রহ্মচর্য্য দেখাতে পারেন, তবেই তাঁদের উপর এত বোঝা চাপানো শোভা পায়, স্বাভাবিক হয়। এদিকে শিক্ষা-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীলোকেরা বুঝতে পারচে যে, তারা শেয়াল কুকুর নয়। স্ত্রীলোকের উপর আমরা যে অযথা অত্যাচার করি, একথা একটু ভেবে দেখ্‌লেই বুঝতে পারবেন। দেখুন না কেন, যে বঙ্কিম বাবু "বিষবৃক্ষে" বলেছেন, "বিধবার যে বিবাহ দিতে চায়, সে যদি পণ্ডিত, তবে মূর্খ কে?" তিনিই শেষটা তাঁর "নবীনা ও প্রাচীনা" নামক প্রবন্ধে স্বীকার করেছেন যে, "আমরা নিজেরা যথেচ্ছাচারী, অথচ স্ত্রীলোক বালিকা-বয়সে বিধবা হলেও তাকে আর বিবাহ দিতে দিই না!"

চন্দ্র। ভাল কথা। শাস্ত্রে বিধবার যে সকল নিয়ম প্রতিপালনের কথা আছে,—যেমন কেশবিন্যাস, বেশভূষা, তাম্বূল, উত্তম শয্যা, সুন্দর পুরুষের সহিত আলাপন ইত্যাদি পরিহার। কিন্তু এখন থেকে মেয়েরা বিধবা হলে আর তা পালন করবে না! স্বামী মরলেও দস্তুরমত বেশবিন্যাস চলবে! কেননা বিবাহ আবার তো হবে।

হরি। বলেন কি? পরপুরুষের সহিত স্বামীর বিনানুমতিতে আলাপন তো সধবারও মহাপাপ। আর স্বামী যার নেই, যে বিধবা হয়েছে, তার তো নিশ্চয়ই এসকল কঠোর নিয়ম পালন করতে হবে। সে যে বিধবা! আবার যখন সধবা হবে (অবশ্য নিঃসন্তান অবস্থায়) তখন স্বামীর চিত্তরঞ্জনের জন্য বেশ-ভূষাদি করবে; বয়স্কা স্ত্রীলোকের স্বামীর চিত্তরঞ্জন ব্যতীত বেশভূষার অন্য উদ্দেশ্য হিন্দু কল্পনা করতে পারে না। কেমন করেই বা সে জানবে যে, তার বিবাহ হবেই? বিবাহ হলে তখন অন্য কথা। দেখুন না কেন, স্বামী প্রবাসে

থাকলেও হিন্দু স্ত্রীর অনেক নিয়ম প্রতিপালনের ব্যবস্থা আছে; যথা,—কবরীবন্ধন, বেশবিন্যাস, উৎসবে নৃত্যগীতে উপস্থিতি ইত্যাদি নিষিদ্ধ। যিনি আপনার আশ্রিতা বিধবাকে (যতদিন পুনর্বিবাহ না হয়) এ সকল নিয়ম পালন না করান, তিনি ঘোর মূর্খ, এবং বিধবার ব্যভিচারের প্রশ্রয়দাতা বলে ঘৃণ্য—অতএব অধার্ম্মিক ও অহিন্দু।

চন্দ্র। আর একটি কথা। স্ত্রীলোক বিধবা হলে তার পতিকুলের অভিভাবকই তো 'গার্ডিয়ান' (guardian) থাকবেন; তিনি যদি এই বিধবার বিবাহ দিতে না দেন?

হরি। প্রথমত সপ্তদশ বৎসর বয়স উত্তীর্ণ হলেই স্ত্রীলোক আইনের চক্ষে সাবালিকা হলেন; তখন তিনি আপনার স্বেচ্ছানুসারে পিতার, ভ্রাতার, শ্বশুরের বা দেবরাদির ঘরে আশ্রয় বেছে নিতে পারেন। কিন্তু স্বেচ্ছার কথা ছেড়ে দিলেও, আমার বিবেচনায়, যদি পিতৃকুলে উত্তম আশ্রয় থাকে এবং তাঁরা আশ্রয় দেন, তবে বৈধব্যের পরে বালবিধবার পিতৃকুলেই আশ্রয় লওয়া কর্ত্তব্য; এবং তাই-ই সচরাচর হয়ে থাকে, দেখা যায়। কারণ, পিতৃকুলের স্নেহ ও অনুরাগ স্বাভাবিক, এবং স্বামী-অভাবে পিতৃকুল হতেই অধিক হিতের এবং যত্নের আশা করা যায়। অতএব বালবিধবার পক্ষে পিতৃকুলই উপযুক্ত আশ্রয়, এবং পিতৃকুলের অভিভাবকই (যদি বালিকার আপত্তি না থাকে, এবং তিনি আবশ্যক বোধ করেন) নিঃসন্তান বালবিধবার পুনর্বিবাহ দিতে পারেন।

চন্দ্র। অর্থাৎ প্রফুল্লর ভগীর বিবাহ প্রফুল্লই কর্ত্তা হয়ে দেবে;—শ্বশুরকুলের কেহ আপত্তি করতে অথবা অভিভাবকতার দাবী করতে এলে তার অর্দ্ধচন্দ্রের ব্যবস্থা করবে! তোমাদের যুক্তি এই যে, যাকে সম্প্রদান করলুম, সে এক মাসের ভিতরেই পটল তুলল, আর তার বাড়ীর লোকেরা কি না এখন আমাদের এত আদরের এত যত্নের মেয়েটাকে নিয়ে গিয়ে যা-ইচ্ছে তাই করতে বসবে;—সংসারের একটা বাঁদী রাখবে। স্বভাব চরিত্র, স্বাস্থ্য ইত্যাদি কিরূপ হয়ে যেতে পারে তার ঠিকানা নেই, তারা তো "পর", তাদের তো গাঁয়ে ঘা লাগবে না;—এই সব আর কি,—কেমন?

হরি। আজ্ঞে অনেকটা তাই-ই বটে।

চন্দ্র। আমি এ সবের মধ্যে থাকতে পারি নে। সরলার জন্য আমি আন্তরিক দুঃখিত, তার ম্লান কচি মুখখানির দিকে চাইলে আমার এ বৃদ্ধ বয়সের কঠিন বুকও ফেটে যায় সত্য। কিন্তু,—বিধবার আবার বিয়ে!! মনে হ'লেও গা ঘিন্ ঘিন্ করে' ওঠে। কেবল তোমাদের দৌড় কতদূর তাই দেখবার জন্যই আমি এসেছিলুম। আর সত্য ছোঁড়াটা বড় ভাল ছেলে, আমাদের খুব ভক্তি-শ্রদ্ধা করে; প্রফুল্লটাও পাগলা, আর চিরকাল আমাদেরই, ওদের অনুরোধ এড়াতে

পারি নি। এখন যুগেই বিদ্যাপ্রকাশ করা হয়েছে হতো? বেলা হয়েছে, আহারাদির চেষ্টায় যাও।

এই বলিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গাত্রোত্থান করিলেন। আমরা তাঁহার ও তর্করত্ন মহাশয়ের পদধূলি গ্রহণ করিলাম। সভাভঙ্গ হইল। তর্করত্ন ঠাকুরদাদাকে বাড়ী পৌঁছাইবার জন্ত আমি ছাতা লইয়া সঙ্গে চলিলাম। সকলে আপন আপন গৃহে চলিলেন।

৮

ভগ্নমনে শুষ্কমুখে বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম। সরলার তবে আর বিবাহ দিতে পারিলাম না। চন্দ্রনাথবাবু বুঝিয়াও বুঝিলেন না, শুনিয়াও শুনিলেন না? তিনি ধনে, মানে, কুলে, শীলে, গ্রামের শীর্ষস্থানীয়; তাঁহার অসম্মতিতে আমিই বা কি করিব, সত্যেন্দ্রনাথই বা কি করিবেন? তর্করত্ন মহাশয় এবং অন্যান্য পণ্ডিত মহাশয়েরা অর্থে বশ হইতেন, কিন্তু চন্দ্রনাথবাবুর সম্মতি কেমন করিয়া পাই?

এমনি করিয়া কিছুদিন কাটিল। আমাদের নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে বিলক্ষণ আন্দোলন চলিতে লাগিল। সকলেই একবাক্যে আমার সাহায্য করিবার জন্ত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। সকলেই শেষে স্থির করিলেন যে, আমরা না হয় একটা পৃথক সম্প্রদায় গঠন করিব। সেকেলেদের, গোঁড়াদের ত্যাগ করিতে শুরু করিব। আমাদের একঘরে করিতে যাইয়া প্রকারান্তরে তাঁহারাই একঘ'রে হইবেন,— কম্বলের লোম বাছিয়া বাছিয়া একখানি পৃথক কম্বল বুনিতে বসিব, প্রথম কম্বল আপনিই লোপ পাইবে। পাকাও স্থির হইল। কয়েক মাস পূর্ব্বে যে ষোড়শীর চিকিৎসায় গিয়াছিলাম, তাঁহার স্বামী ওকালতী পাশ করিয়া আলিপুরে প্র্যাক্‌টিস্ করিবেন স্থির করিয়াছেন; অনেক সুন্দরী কুমারী তাঁহার সম্মুখে ধরিয়া তাঁহার দাদা, বন্ধুবর্গ এবং বৌদিদি তাঁহাকে বিবাহে প্ররোচিত করিতেছেন। কিন্তু সবই বিফল হইয়াছে। সংসারের কথা বলিলে তিনি বলেন, "বিদেশে যখন থাকবো তখন অর্থভোগী ভৃত্যেরা আমার সেবা করবে, অসুখ-বিসুখ হলে ছুটে বৌদিদির কাছে আসবো। তিনি কি আমায় ক্রোড়ে স্থান দেবেন না? আমি যে তাঁর বড় ছেলে, তিনি যে আমার মা, বৌদিদি ঘরে আসা অবধি আমি যে মায়ের অভাব বুঝতে পারি নি" বলেন আর কাঁদেন। বলেন, "একটি ছেলেতো হয়েছে, না বাঁচে, দাদার পুত্রের দ্বারা পিতার বংশরক্ষা হবে। যে দিন সে মরেছে, সেইদিন আমিও মরেছি।" এই সকল প্রলাপ তাঁহার মুখে সর্ব্বদা শুনিতে পাওয়া যায়। অথচ অন্য প্রসঙ্গে স্থির, অবিচলিত, প্রফুল্লবদন, মিষ্টভাষী, কার্য্যতৎপর এবং উৎসাহী।

একদিন সত্যেন্দ্রনাথ তাঁহাকে অন্যান্য অনেকগুলি বন্ধুবান্ধবসমেত নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। আমাদের গ্রামেরও অনেক

নব্য যুবক সেই সঙ্গে রহিলেন। আত্মীয়াস্থে সকলে মিলিয়া তাঁহাকে (সরলাকে) বিবাহ করিবার জন্ত ধরিয়া পড়িলেন। তিনি স্বীকার করিলেন,—"প্রফুল্লবাবুর ভগ্নীর নিশ্চয়ই বিবাহ হওয়া উচিত।" এবং এ বিষয়ে সাহায্য করিতেও প্রতিশ্রুত হইলেন। কিন্তু নিজে বিবাহ করিতে চাহিলেন না। বলিলেন, "আমার স্ত্রী আছেন।" এবং পকেট হইতে একখানি সুন্দর ফটো বাহির করিয়া দেখাইলেন—সেখানি তাঁহার মৃতা সহধর্ম্মিণীর। ঝাড়া পাঁচ ঘণ্টা সকলের সমবেত অনুরোধ, উপরোধ এবং যুক্তিপ্রদর্শন ও প্ররোচনার পর অবশেষে কেবল example set করিবার জন্ত এ কার্য্যে স্বীকৃত হইলেন।

সত্যেন্দ্রনাথ সরলাকে দেখাইতে চাহিলেন, তাহাতে তিনি বলিলেন "অনাবশ্যক।" তারপর সত্যেন্দ্রনাথ সরলার গুণব্যাখ্যা করিয়া যখন রূপের কথা বলিলেন, তিনি লজ্জিতভাবে বলিলেন, "আজ্ঞে আমি তো এ সব কথা কাউকে জিজ্ঞাসা করি নি—ক্ষমা করবেন।" তথাপি সত্যেন্দ্র বলিলেন, "প্রফুল্লকে দেখলেই আমার শ্যালিকাকে দেখা হ'ল—সব এক ছাঁচ।" এই কথার পর অন্ত কথা উঠিল।

বাস্তবিক আমরা ভাই-বোনে সব দেখিতে এক—এক ছাঁচ, এক রং, এক গড়ন। আমার ভগ্নীদের রূপ গুণের সুখ্যাতি গ্রাম-গ্রামান্তরেও ছিল। মালতী ভিন্ন তাহাদের জোড়া নিকটে কমই ছিল। ইনিও বোধ হয় তাহা লোকমুখে শুনিয়া থাকিবেন। একবার দুর্গোৎসবের বিজয়ার দিন আমাদের নদীতে বাচ্ হইতেছে, তখন মেজদির বয়স একাদশ বৎসর, বিবাহ হয় নাই;—তিনি এলোচুলে আল্‌বার্ট কাটিয়া (মা প্রায় তাঁকে এলোচুলেই রাখিতেন) সাজিয়া গুজিয়া পাড়ার আর আর মেয়েদের সঙ্গে নদীর ধারে দাঁড়াইয়া ঠাকুর দেখিতেছিলেন;—শারদসায়াহ্নের চিক্‌চিকে পড়ন্ত রৌদ্র তাহার মুখের উপর পড়িয়াছিল; তাই দেখিয়া নটাবেড় গ্রামের বৃদ্ধ দেওয়ানজি মহাশয় তাঁহার নৌকায় বসিয়া বলিয়াছিলেন, "জলের প্রতিমা দেখিব, না ঐ স্থূল ডাঙার প্রতিমা দেখিব, ভাবিয়া পাইতেছি না।"

পাত্রও স্থির হইল, দলও বাঁধা হইল, অনেক কষ্টে মেজদি ও সরলাকে রাজী করাইলাম। সব ঠিকঠাক্। সরলাকে মেজদি আপনার বাড়ীতে লইয়া গেলেন। একজন সুশিক্ষিত স্মৃতিশাস্ত্রবিৎ পুরোহিত পৌরোহিত্য করিতেও রাজী হইলেন। সব প্রস্তুত—দুদিন পরেই বিবাহ। এমন সময় সরলা কি না পলায়ন করিয়া শ্বশুরালয়ে চলিয়া গেল! তাহার মনের ভাব কেন এমন হইল? ভাল, চিরকাল কঠোর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকিতে পারে, সেতো ভাল কথা। থাকুক—

মৃতে ভর্ত্তরি যা নারী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা।
সা মৃতা লভতে স্বর্গং যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ ॥

(ক্রমশঃ) শ্রী প্রবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

মার্কিণ ও বঙ্গমহিলা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সংসার

আমেরিকার মহিলারা বলেন :— "অমুকের শুধু টাকা আছে বলে বিবাহ করিয়ো না, এবং যাঁহার টাকা নাই তাঁহাকেও বিবাহ করিয়ো না, কিন্তু যাঁহার টাকা রোজগার করিবার ক্ষমতা আছে, তাঁহাকেই বিবাহ করিয়ো।" সুদূর পাশ্চাত্য দেশের লোকেরাও "ষোড়শী বালিকার" (sweet sixteen) পাণিগ্রহণে ইচ্ছুক। কারণ অধিক বয়সের মেয়েরা সহজে বিবাহে মত প্রকাশ করেন না। সুতরাং সুদীর্ঘ কোর্টসিপের প্রয়োজন। পরিশেষে এমন ঘটে যে, ঐরূপ যুবতীর অনেকগুলি প্রার্থী (suitor) হয়। এবং নিজে tasted girl নামে দশের নিকট পরিচিত হন।

কোনো কোনো মার্কিণ মহিলা বেশি সন্তান হওয়া পছন্দ করেন না; তাঁহারা তাঁহাদের ক্ষমতা অনুযায়ী যে কয়েকটিকে মানুষ করিতে পারিবেন তার বেশি সন্তান ভগবানের নিকট কামনা করেন না। কেহ কেহ অন্তঃসত্ত্বা হইবামাত্র, যতদিন না সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, ততদিন তিনি যে ঘরে বেশিক্ষণ থাকেন সেই ঘরটিকে বিশেষভাবে সাজাইয়া রাখেন। তাঁহাদের বিশ্বাস যরটি যদি বক্তার ছবিতে সজ্জিত থাকে, তবে সে-গর্ভের পুত্র বড় বক্তা হইবে, যদি প্রচারকের ছবিতে সজ্জিত থাকে, তবে সেই গর্ভের পুত্র একজন ধর্ম্মপ্রচারক হইবে, যদি সুন্দরী বালিকার ছবিতে সজ্জিত থাকে, তবে সেই গর্ভে সুন্দরী বালিকার জন্ম হইবে। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে, তখনি তাহাকে ওজন করা হয়। তারপর যখন বাৎসরিক শিশু-প্রদর্শনী (B.by show) হয়, তখন শিশুকে প্রদর্শনীতে পাঠান হয়, প্রদর্শনী কার্ডে শিশুর মাতার নাম, বয়স, ওজন ও প্রথম বা দ্বিতীয় সন্তান তাহাও লেখা থাকে। সে দেশের মাতারা সতত চেষ্টা করেন ও এমনভাবে জীবনযাপন করেন যাহাতে বলিষ্ঠ শিশু প্রসব করিতে পারেন, এবং যাহাতে ভবিষ্যতে আমেরিকার বংশ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বংশ বলিয়া গণ্য হয়। আমাদের দেশে ঐ রকম শিশু প্রদর্শনী মধ্যে মধ্যে খুলিলে ভাল হয় না কি?

আমাদের দেশে যদি কাহারো একটি কন্যা ভূমিষ্ঠ হয়, আমরা সকলেই একটু ত্রস্ত হই। কারণ সে মেয়ের বিবাহ দিতে হইবে, অনেক টাকার দরকার হইবে, এবং পরিশেষে সে পরগৃহে চলিয়া যাইবে।

আমেরিকাতে কন্যা ভূমিষ্ঠ হইলে সে পরিবারে খুবই আনন্দ, কারণ সেই মেয়ের বিবাহ দিলে সেই পরিবারে আর একটি সন্তান (অর্থাৎ ভাবী জামাতা) হইবে। আমেরিকাতে আমি যে পরিবারে ছিলাম, সেই পরিবারের পুত্রবধূ যখন পিতৃ-আলয়ে যান, তখন তাঁহার শ্বশুর তাঁহাকে চুম্বন করিলেন দেখিয়া আমি Rev. Poeক (যিনি এই বাড়ীর কর্ত্তা ও পুত্র-বধূর শ্বশুর) বলি—আমাদের দেশে এরূপ প্রথা নাই। তিনি তদুত্তরে বলেন,—"আমরা আমাদের জামাতা ও পুত্রবধূকে আপনার পুত্র কন্যার ন্যায় দেখিয়া থাকি।"

আমেরিকার কোনো কোনো মহিলা স্বামী অপেক্ষা বেশি মিতব্যয়ী। একবার একজন স্বামী তাঁহার স্ত্রীকে বলেন,—"তুমি কেন মিসেস্ অমুকের মতন পোষাক পরিতে পার না?" তদুত্তরে স্ত্রী বলিলেন,—"আমাদের টাকায় কুলিয়ে উঠে না।" হোটেলের waiterদের বলিতে শুনিয়াছি, যে ডিনার পুরুষের কাছে সস্তা মনে হয়, তাহা স্ত্রীলোকদিগের নিকট মহার্ঘ।

সম্মান।

নারীজাতি কিরূপ সম্মান পাইয়া থাকে, তাহা যদি পাঠক পাঠিকা দেখিতে ইচ্ছা করেন, তবে আমেরিকায় তাহা দেখিতে পাইবেন। সভাতে, ক্লাসে সকল স্থানেই মহিলাদিগকে সর্ব্বোচ্চ ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্থান দেওয়া হয়। ট্রাম গাড়ীতে কিম্বা রেলগাড়ীতে ভ্রমণ করিবার সময় যদি গাড়ীতে স্থান না থাকে, তবে কোনো-না-কোনো পুরুষ স্বীয় স্থান তৎক্ষণাৎ রমণীর জন্য ছাড়িয়া স্বয়ং দাঁড়াইয়া যাইবেন। দোকানে কোনো দ্রব্য ক্রয় করিতে যাইতে পুরুষের পরে যে মহিলা কিছু কিনিবার জন্য আসেন, তাঁহাকে আগে কিনিতে দিয়া পুরুষ পরে কিনিবেন বলিয়া অপেক্ষা করিয়া থাকেন। রমণীর সহিত একত্র বেড়াইতে বাহির হইলে, জনতাতে রমণীকে আগে হাঁটাইয়া পুরুষ তাঁহার বা ধরিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ থাকেন। দুরন্ত শীতে গির্জ্জাতে ঢুকিয়া যখন মহিলারা ভারী over-coat খুলিয়া বসেন তখন পার্শ্বস্থিত ব্যক্তিরা সেই over-coat তাঁহাদের গায়ে পরাইয়া দিবার জন্য সাহায্য করিয়া থাকেন। টাইটানিক্ জাহাজ যখন আট্‌লাণ্টিক্ মহাসাগরে ডুবিয়া যায়, তখন জীবন-রক্ষার্থ নৌকা করিয়া আরোহীদিগকে বাঁচাইবার জন্য এই নিয়ম ঘোষণা করা হয়—প্রথমে শিশু সন্তানেরা, তাহার পর মহিলারা, তাহার পর পুরুষেরা। ক্রমে ক্রমে জীবনরক্ষার নৌকাতে উঠিবেন। আসন্ন বিপদকালেও যেখানে রমণীকুল সম্মান পাইয়া থাকেন।

শ্রীসত্যশরণ সিংহ।

পাচন ও মুষ্টিযোগ।

ঘুস্ড়া

সেকালের প্রাচীনা গৃহিণীগণ, এমন কি কবিরাজ মহাশয়রাও, কাহারো পুরাতন জ্বর হইলে ঘুস্ড়া ঔষধ ব্যবস্থা করিতেন। এই ঘুস্ড়া ঔষধ পুরাতন জ্বরে মহা উপকারী। আজকাল জ্বর হইলেই প্রায় পুরাতন জ্বরে দাঁড়ায়। পুরাতন জ্বরে মূল্যবান্ ডাক্তারি বা কবিরাজী ঔষধ সেবন না করিয়া পল্লীবাসী গৃহস্থগণ অনায়াসেই গৃহে বসিয়া এই ঔষধ প্রস্তুত করত সেবন করিয়া দেখিতে পারেন; ইহাতে উপকার হয় কি না। সেকালে ইহা সর্ব্বদা ব্যবহৃত হইত, তখন এত ডাক্তার কবিরাজ ছিল না লোকে নিজ নিজ চেষ্টাতে বিনাব্যয়ে রোগ হইতে আরোগ্যলাভ করিতেন। দুঃখের বিষয় বর্ত্তমান সময়ে এই মহা উপকারী ঔষধের নাম পর্য্যন্ত অনেকে জানেন না! অতএব কি প্রকারে ইহা প্রস্তুত ও সেবন করিতে হয়, তাহা বলা বোধ হয় অনাবশ্যক হইবে না। নানাবিধ পেটেণ্ট ঔষধ ব্যবহার অপেক্ষা লোকে ইহা ব্যবহার করিলে সুফল লাভ করিতে পারেন।

ঘুস্ড়া প্রস্তুতের নিয়ম।

শুলফ, ক্ষেৎপাপ্ড়া ও শিউলিপাতা (কাহারো কাহারো মতে অথবা প্রয়োজন বুঝিলে আদাও একভাগ দেওয়া হয়) এই তিনটি দ্রব্য প্রত্যেকটি সমান পরিমাণ লইয়া একত্রে অল্প ছেঁচা করিয়া কচি কলাপাতাদ্বারা চারি পাঁচ পুরু করিয়া বাঁধিতে হইবে। অনন্তর সেই পুঁটুলির উপর-নীচে ঘুঁটের আগুন দিয়া যাহাতে পুঁটুলি-মধ্যস্থ ঔষধগুলি উত্তমরূপে সিদ্ধ হয় তত সময় রাখা উচিত। পরে শীতল হইলে কলাপাতা খুলিয়া ঔষধটি গ্রহণ করিবে। এই ঘুস্ড়ার রস প্রতিদিন সকালে দুই তোলা ও বৈকালে দুই তোলা অল্প-মধুর সহিত সেবন করিলে বিশেষ উপসর্গহীন প্রায় অধিকাংশ পুরাতন জ্বরের শান্তি হইয়া থাকে। বাসী ঘুস্ড়ায় তত উপকার হয় না। প্রতিদিন নূতন নূতন করিয়া খাওয়াই ভাল।

(স্বাস্থ্য-সমাচার)

রবি ও শশী।

নবীন তপনে হেরি লোহিত বরণ,
ম্লান শশী কহে ধীরে বিষাদে মগন;—
"যবে আমি পুনরায় হইব উদিত,
হবে তব দীন দশা হাসি-বিরহিত।"

কহে রবি, "তেজোহীন অবোধ চন্দ্রমা,
মোর করে তব কর জানে সেই অমা;
জাননা অবোধ তুমি সতের ধরণ,
উদয়ে বিষাদে মোর একই বরণ।"

শ্রীননীবালা দেবী।

সংবাদ।

১। এইরূপ শুনা যাইতেছে যে ২রা এপ্রেল বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ মহোদয় বোম্বাই বন্দর হইতে ডাক-জাহাজে স্বদেশ যাত্রা করিবেন। ভাবী বড়লাট লর্ড চেমসফোর্ড ২১শে মার্চ্চ বোম্বাই বন্দরে পৌঁছিবেন।

২। হায়দ্রাবাদের নিজাম বাহাদুর অখিল ভারতবর্ষীয় মুসলমান শিক্ষাসমিতির ভাণ্ডারে প্রচুর অর্থ দান করিয়াছেন।

৩। ডাক্তার সার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বাঁকুড়ার দুর্ভিক্ষ-পীড়িত নরনারীর দুঃখমোচনের জন্য "ফাল্গুনী" নামক একখানি নাটকের অভিনয় করিয়াছিলেন, এই অভিনয়ে ৮১৭১ টাকা উঠিয়াছিল। এই অর্থ সমুদয়ই দুর্ভিক্ষে দান করিয়াছেন। অভিনয় ব্যাপারে ১০৩১ টাকা ব্যয় হইয়াছে। এই টাকা সমস্তই শ্রীযুক্ত সার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়গণ বহন করিয়াছেন।

৪। সম্প্রতি অষ্ট্রিয়ানগণ এক প্রকার নূতন যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছে শুনা যাইতেছে। এই যন্ত্র হইতে ৮০ হাত দীর্ঘ অগ্নিশিখা বহির্গত হয়।

৫। বরদার মহারাজা গায়কোয়াড় স্বরাজ্যে বিদ্যালয়সমূহের ছাত্রগণের দৈহিক অবনতির কারণ অনুসন্ধান করিয়া অবধারণ করেন, ছাত্রগণের উপযুক্ত আহারের অভাবই তাহাদের দৈহিক অবনতির কারণ। ইহার প্রতিকারার্থে তিনি বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের জন্য বিনামূল্যে উপযুক্ত জলখাবারের ব্যবস্থা করেন। এই ব্যবস্থায় ছাত্রদিগের স্বাস্থ্যের আশাতিরিক্ত উন্নতি হইয়াছে। এদেশের অধিকাংশ ছাত্রই অনাহারে গুরুতর পরিশ্রম করিয়া অকালে প্রাণত্যাগ করে। এই ব্যবস্থা যদি এদেশে করা হয় তাহাহইলে ছাত্রগণের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইতে পারে।

৬। স্ত্রীশিক্ষাবিস্তার। সংপ্রতি মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট ৩ মাসের মধ্যে ৪৪টি বালিকাবিদ্যালয় স্থাপনের নিমিত্ত ২০ হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টের এই কার্য্য বিশেষ প্রশংসনীয়।

৭। পুণা মহিলাশ্রমের প্রধান শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী কৃষ্ণবাই ঠাকুর ও অধ্যাপক কার্ভে এলাহাবাদে আসিয়া মিঃ সি, ওয়াই, চিন্তামণির নেতৃত্বাধীনে এক সভায় স্বতন্ত্র মহিলা-বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন।

বামারচনা।

সুভদ্রা-পরিণয়।

কোদণ্ড টঙ্কারে সুরাসুর নরে
তুমি এবে করিয়া কম্পিতকায়।
কেন গো ফাল্গুনী হ'য়ে বীরমণি
রৈবতক দুর্গে লইয়া আশ্রয়।
গুণময় গাণ্ডীব করিয়ে নির্জ্জীব
নাহি জানি এখন কাহার শরে
হইয়ে আহত ত্যজি বীরব্রত
কাটাইছ কাল অধীর অন্তরে।
হেন অনুমানি বুঝি গুণিখানি
যাদব-কুমারী করিয়াছে জয়।
চারু উপবনে সুভদ্রার সনে
হইয়াছে বুঝি চিত্ত-বিনিময়।
অথচ নেহারি বেশে ব্রহ্মচারী
আচরণে তার বিপরীত ভাব।
সন্ন্যাসী ধরম চিত্তের সংযম,
কুলবালা-পরে দৃষ্টি অসম্ভব।
পাণ্ডবগৌরব সব পরাভব
নারী-হস্তে আজি পাণ্ডুকুলমণি।
ত্রিভুবন জয় করিয়ে বিজয়
রহিলে হেথায় পরাজয় মানি।

যাহার কারণে রয়েছ এখানে
সে যে অসামান্যা রমণীকুলে।
বসুদেবাত্মজা শ্রীকৃষ্ণ-অনুজা
অনুপমা বামা হয় এ ভূতলে।
আশ্রয়দাতার প্রতি এ প্রকার
অনুচিত তব হেন ব্যবহার।
জ্ঞাতিদের ব্রত করি বিধিমত
যাদবের এই যোগ্য পুরস্কার।
রেবতীরমণ শুনিবে যখন
কেমনে সে রোষে পাইবে ত্রাণ?
দাবানল সম যে ক্রোধ বিষম
জলধির জলে না হবে নির্ব্বাণ।
অথবা যে পদ ভবের সম্পদ,
সে শ্রীপদে যবে লয়েছে শরণ।
ভদ্রা-পাণিতল তব করতল
সংশয় ইহাতে নাহিক কোন।
ধন্য কাশীদাস ভারতীর দাস
তোমার অতুল কল্পনার বলে
ভদ্রা-পরিণয় নরনারীচয়
হেরে ধন্য হলো এ ধরণীতলে।

শ্রীসরলাবালা বিশ্বাস।

৩০ নং মধুরায় লেন, ইণ্ডিয়ান্ প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৩১ নং আণ্টনিবাগান হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা

No. 631 1916

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"
কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।
স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি-এ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৩ বর্ষ। ৬৩১ সংখ্যা। { ফাল্গুন, ১৩২২। মার্চ্চ, ১৯১৬। } ১০ম কল্প। ৪র্থ ভাগ।

গান।

ওরে ভীরু, তোমার হাতে নাই ভুবনের ভার।
হালের কাছে মাঝি আছে
করবে তরী পার।
তুফান যদি এসে থাকে
তোমার কিসের দায়—
চেয়ে দেখ ঢেউয়ের খেলা,
কাজ কি ভাবনায়?
আসুক নাকো গহন রাতি,
হোক্ না অন্ধকার—
হালের কাছে মাঝি আছে
করবে তরী পার।
পশ্চিমে তুই তাকিয়ে দেখিস্
মেঘে আকাশ ডোবা;
আনন্দে তুই পূবের দিকে
দেখ্‌না তারার শোভা।
সাথী যারা আছে, তারা
তোমায় আপন বলে'
ভাব কি তাই রক্ষা পাবে
তোমারি ঐ কোলে?
উঠ্‌বে রে ঝড় দুল্‌বে রে বুক
জাগ্‌বে হাহাকার—
হালের কাছে মাঝি আছে
করবে তরী পার।

২

সারা জীবন দিল আলো
সূর্য্য গ্রহ চাঁদ,
তোমার আশীর্ব্বাদ, হে প্রভু,
তোমার আশীর্ব্বাদ।
মেঘের কলস ভরে ভরে
প্রসাদ-বারি পড়ে ঝরে
সকল দেহে প্রভাত-বায়ু
ঘুচায় অবসাদ—
তোমার আশীর্ব্বাদ, হে প্রভু,
তোমার আশীর্ব্বাদ।
তৃণ যে এই ধূলার পরে

পাতে আঁচলখানি,
এই যে আকাশ চির-নীরব
অমৃতময় বাণী—
ফুল যে আসে দিনে দিনে
বিনা রেখার পথটি চিনে,
এই যে ভুবন দিকে দিকে
পুরায় কত সাধ,
তোমার আশীর্ব্বাদ, হে প্রভু,
তোমার আশীর্ব্বাদ।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

প্রত্যাবর্ত্তন।

(গল্প)

পিতা মাতা আদর করিয়া তাহার নাম রাখিয়াছিলেন বিনয়ভূষণ, কিন্তু বয়োবৃদ্ধির পর তাহার প্রকৃতিতে বিনয়ের কোনো লক্ষণই দেখা গেল না, বরং দিন-দিন তাহার বিপরীত গুণটাই প্রকাশ পাইতে লাগিল। বিনয়ের বয়স ও গুণের আতিশয্য যতই বাড়িতে লাগিল, পাঠশালার গুরুমহাশয় হইতে গ্রামের অধিবাসিবৃন্দ ততই দিন-দিন শঙ্কিত হইয়া উঠিতে লাগিলেন। কোন দিন কাহার উপর যে তাহার শুভদৃষ্টি পড়িবে তাহার কিছুই স্থিরতা ছিল না। যদি কেহ তাহার অত্যাচারে উত্ত্যক্ত হইয়া তাহাকে কিছু বলিত তাহা হইলে তাহার দুর্দ্দশার আর অন্ত থাকিত না। কে যে কোথা হইতে অলক্ষ্যে নানা উৎপাৎ ঘটায় তাহার সন্ধান কেহ পায় না, কিন্তু উপদ্রবের জ্বালায় তাহাকে অস্থির হইয়া উঠিতে হইত।

ভট্টাচার্য্য-মহাশয় তাঁহার সযত্নরোপিত কলমের আমগাছটির প্রথম ফল-দুইটি দেবতার উদ্দেশে উৎসর্গ করিয়া রাখিয়াছিলেন। আর দুই এক দিন গেলে সুপক্ক আম-দুইটি গৃহদেবতার ভোগে দিবেন ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হইবার আগেই একদিন প্রভাতে তিনি দেখিলেন, বিনয়ভূষণ অতি নিশ্চিন্তভাবে সেই দেবোদ্দিষ্ট ফল-দুইটি নিজের ভোগে লাগাইতেছেন! এই দুর্ব্যবহারে সহসা অতিমাত্রায় উত্তপ্ত হইয়া যখন তিনি বিনয়কে 'পাষণ্ড বেল্লিক পরস্বাপহারী দুর্ব্বৃত্ত' ইত্যাদি নানা অভিধানে ভূষিত করিতেছিলেন, তখন বিনয়ভূষণ অতি নিরীহভাবে তাঁহাকে জানাইলেন যে, তাঁহার ন্যায় শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের পক্ষে এই ভেদবুদ্ধি কিছুতেই শোভা পায় না; যেহেতু তিনি নিজেই কতবার বলিয়াছেন যে, ভগবান এই স্থাবরজঙ্গমময় বিশ্বের সর্ব্বভূতে আত্মারূপে অবস্থিত রহিয়াছেন; সুতরাং দেবোদ্দিষ্ট ফল দুইটি শিলাময় দেবতার ভোগে না লাগিলেও মূলতঃ তাঁহাকেই সমর্পিত হইয়াছে। ভট্টাচার্য্যের উষ্ণ মস্তিষ্ক এই মহতী উক্তির গভীরতা উপলব্ধি করিতে পারিল না। তিনি বিনয়কে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিলেন ও তাহার ন্যায় দুষ্কৃতকারী নরাধমের যে- ইহকাল বা পরকালে কোথাও সুগতি নাই তাহা বিশেষভাবে সকলের কাছে ঘোষণা করিতে লাগিলেন।

এই ঘটনার ৫।৭ দিন পরে একদিন দেখা গেল, ভট্টাচার্য্যের সেই অতি যত্নের ফলন্ত গাছটি কাহার নিষ্ঠুর কুঠারাঘাতে ছিন্ন ভিন্ন এবং তাঁহার দুগ্ধবতী গাভীটি তাহার চিরপরিচিত আবাস ত্যাগ করিয়া কোন অজ্ঞাত স্থানের উদ্দেশে যাত্রা করিয়াছে।

বিস্তর সন্ধানেও তাহাকে না পাইয়া যখন গাভী ও গাছের শোকে ভট্টাচার্য্য একান্ত ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহার গৃহিণী সেই অজ্ঞাত উৎপীড়কের ও তাহার চতুর্দ্দশ পুরুষের উদ্দেশে